২০১০–’১৫–প্রথম দশকের সম্ভাব্য কবি ও কবিতার গতি-প্রকৃতি

© জুবিন ঘোষ

শূন্য দশকের রেশ যখন শেষ হয়নি, পিঠোপিঠি আর একটা ভাতৃসম দশক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির পথে সদর্প পদক্ষেপ রেখেছে, নতুন কবিতায় তারাই এখন সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে রাজদণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছে। বর্তমানের কবিতা যাপনশৈলী, দার্শনিকবোধ, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাসারে নতুন রাস্তা দেখাবে কিনা তা এখনও বলা যায় না। তবে প্রথম দশকের কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের এযাবৎ কাব্য ধারণার প্রতীকায়ন ঘটাচ্ছে, সীমানাপ্রাচীর ভাঙছে অনায়াসেই।

বাংলা কবিতার বয়স হাজার বছর। চর্যাপদ থেকে হাজার বছরের পথপরিক্রমায় আশ্চর্যময় নানান বাঁক নিয়েছে বাংলা কবিতা। নানাবিধ কারণে মঙ্গল-কাব্য, পুঁথি-কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলির মাধ্যমে পেয়েছে বহুবর্ণিল রূপ। হেমচন্দ্র, নবীচন্দ্র, বিহারীলাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ উনিশ শতকের কবিরা বৃটিশ ঔপনিবেশিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলা কাব্যচর্চায় তুলে ধরেছিলেন সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যকে। সেই একঘেয়েমি ছান্দিক প্রবণতাকে অমিত্রাক্ষরে ভেঙে মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বাংলা কবিতাকে বিশ্বকবিতার কক্ষপথে আরও কিছুটা চারিয়ে দেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনসাধনে আধ্যাত্মিক রোমান্টিকতায় ব্যাপ্তি দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিয়ে আসেন নতুন দুটি ছন্দ – কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত এবং বলাকার ছন্দ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং বৈষম্যবিরোধী ‘একই বৃন্তে দুটি কুসুম’-এর স্বরে এক বিপ্লবী মেজাজ সঞ্চার করেন কাজী নজরুল ইসলাম। ত্রিশের দশকের কবিগোষ্ঠী বাস্তবিক আধুনিকতার উন্মেষ ঘটালেও সে আধুনিকতা ছিল অনেকটাই শেকড়চ্যুত। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ তার অক্ষরবৃত্তে এক নতুন স্বাদ এনে বাংলা কবিতায় সত্যিকারের প্রগতিশীলতার একটা মাইলস্টোন পুঁতে গেলেন। বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে অমিয় চক্রবর্তী, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ উচ্চ শিক্ষিত কবিদের হাতে বানলা কবিতা কিছুটা জড়ত্ব পেলেও বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতায় একটা মানদণ্ড স্থাপন করে প্রতিষ্ঠা করলেন আধুনিক বাংলা কবিতার শিল্পতত্ত্ব। চল্লিশের কবিরা মুখের ভাষা কবিতাকে কিছুটা মুক্তি দিলেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতায় আনলেন গল্পের আভাস, সঙ্গে মসৃণ করলেন ছন্দ ভাবনা। সাতচল্লিশের দেশভাগ বাংলা কবিতাকে করেছে দ্বিচারী। পাঁচের দশকের কবিদের কবিতা রবীন্দ্র-জীবনানন্দ প্রভাব কাটিয়ে স্বীকারক্তিমূলক কবিতার স্বাদ দিয়ে গেছে। একই সঙ্গে পাঁচের দশকের হাত ধরে বাংলা কবিতা পুনরায় পেয়েছে প্রান্তীয় থেকে আন্তর্জাতিকতার ব্যাপ্তি। সাধারণ পাঠকদের মধ্যে পাঁচের দশকের শঙ্খ ঘোষ-শক্তি চট্টোপাধ্যায়-বিনয় মজুমদার-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-উৎপলকুমার বসু-অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-আলোক সরকার-শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় -স্বদেশ সেন-অমিতাভ দাশগুপ্ত-মনীন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ কবিদের কবিতার আচ্ছন্নতা ব্যপ্ত থেকেছে আজও। এছাড়াও পাঁচের দশকে দাগ কেটে থাকলেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অরবিন্দ গুহ, সমীর রায়চৌধুরী, দিব্যেন্দু পালিত, তারাপদ রায়, কবিতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন, রাজলক্ষ্মী দেবী, শিবশম্ভু পাল, আনন্দ বাগচী, পূর্ণেন্দু পত্রী, সুনীল বসু, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ছয়ের দশকে কিছু কবিদের হাতে কবিতা আন্দোলনমুখী হয়, আমরা পাই হাংরি জেনারেশন, শুদ্ধ কবিতা, এবং শ্রুতি আন্দোলন। এই পর্বে ছাপ রেখে চললেন ভাস্কর চক্রবর্তী, মলয় রায়চৌধুরী, প্রভাত চৌধুরী, আশিস সান্যাল, মৃণাল বসুচৌধুরী, পুষ্কর দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কার্তিক মোদক। ষাটের আন্দোলন যখন ম্রিয়মান, বাংলার অশান্ত রাজনৈতিক পরিবেশে গর্জিত সত্তর হয়ে ওঠে যথার্থ মুক্তির দশক, পাঁচের দশকের পর আবার একসঙ্গে বেশ কয়েকজন ভালো কবিকে আমরা পাই যেমন- মৃদুল দাশগুপ্ত, সুবোধ সরকার, জয় গোস্বামী, নবারুণ ভট্টাচার্য, শ্যামলকান্তি দাশ, রনজিৎ দাশ, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর চক্রবর্তী, দীপক রায়, বারীন ঘোষাল, পার্থ রাহা, কমল চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে। কবিতার মধ্যে ঢুকে যায় একরকম জোর পাওয়া স্পিরিট। পরের আটের দশক

মিডিয়া আনুকুল্য থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কবিতার ভাব দর্শনে ও গভীরতায় পুনরায় মনোনিবেশ করে। তবুও নিভৃতেই স্বাতন্ত্র সিগনেচার স্টাইল তৈরি করে যেতে লাগলেন পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, মল্লিকা সেনগুপ্ত, জহর সেন মজুমদার, উজ্জ্বল সিংহ, গৌতম ঘোষদস্তিদার, অলোক বিশ্বাস, অলক বিশ্বাস, রাহুল দাশগুপ্ত, সৈয়দ হাসমত জালাল, অমল কর, প্রবালকুমার বসু, রামকিশোর ভট্টাচার্য, নাসের হোসেন, মুরারি সিংহ, কাজল চক্রবর্তী, মৃণালকান্তি দাশ, রূপা দাশগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, প্রসুন ভৌমিক, সৌমিত বসু, ধীমান চক্রবর্তী, তাপস রায়। এই সময় কবিতা ক্রমশ আরও মিতভাষী হয়। নব্বইয়ে কবিতায় ফিরে আসে ছন্দময়-রোমান্টিকতা। পুনরায় আরও কিছু কবি মিডিয়া আনুকুল্য পান। স্টারডম ব্যাপারটা এই দশক থেকে ক্রিয়াশীল হয়। এক পর্বে পিনাকী ঠাকুর, বিভাস রায়চৌধুরী, শ্রীজাত, পৌলমী সেনগুপ্ত, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দাক্রান্তা সেন, আবীর সিংহ, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্র শংকর, সুদীপ্ত সাধুখাঁ কবিতায় উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছেন। এই সময় একইসঙ্গে বাংলা কবিতায় পোস্ট মর্ডান আন্দোলন তৈরি হয় যেটা তারও আড়াই দশক ধরে ধরে রাখতে সমর্থ হয়। শূন্য দশকের কবিতায় আধুনিক হবার বাসনায় ক্রমশ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরতে থাকে, কবিতা হয়ে ওঠে সংক্ষিপ্তরূপী, সাধারণ পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্যতার দায়ে দুষ্ট হয়, তবে শূন্য দশক বিগত সমস্ত দশকের কাটিয়ে উঠেছিল বলেই ধারণা, বেশিরভাগ কবিতা হয়ে ওঠে স্টেটমেন্টধর্মী, ওপেন এন্ডেড জার্নি, এবং সার্বিকতা থেকে সরে এসে কবিতার মধ্যে বহুরৈখিক হয়ে ওঠার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। বিদেশি কবিতার প্রভাবে ক্রমশ পাঠকদের থেকে ক্রমশ বিচ্যুত হতে থাকে। বাংলার পাঠক এখনও কবিতাকে এইভাবে নেবার জন্য তৈরি ছিল না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। পঞ্চাশ বছরের লালনে-সৃজনে বৈচিত্র্যতর হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতা। আধুনিক বাংলা কবিতা বিশ্বকবিতার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কিনা তা স্পষ্ট না হলেও ভাব, বিষয় এবং আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে ঋদ্ধ করেছে সুনিশ্চিত। এপার বাংলায় রচিত এই প্রথম দশকের কবিতার গতি-প্রকৃতি নিয়ে লালনে-সৃজন ও বৈচিত্র্যের খোঁজে এবং সর্বপরি তার নিরিখে নিজস্ব আত্মানুসন্ধানের জন্যই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি আলোচনায় হাত দিয়েছি। এই সময়ের নানা স্রোত , টানাপোড়েন , অনুভব , পার্টিশন, অবক্ষয় , তারুণ্যের হুল্লোড় আর একাধিক বাঁকের সন্মুখে একদল ছিটকে বেড়িয়ে আসা মানুষ নম্বরের তোয়াক্কা না করে, সমস্ত ভার্জিনিটি ছেড়ে ভাষা বদলাবে সেটাই চাই। আমাদের সময়ের পিঠোপিঠি একটা ভাতৃসম দশক সদর্প পদক্ষেপে নতুন কবিতায় পা রাখার সূচনায় আমার এই আলোচনা বাংলা কবিতায় নতুন কিছু দিতে হয়তো পারবে না, শুধু সাহিত্যের পাতায় এইসব ভালোবাসার অনুজপ্রতিম কবিদের কবিতার প্রতি আমার চিরস্থায়ী মুগ্ধতা রেখে যেতে পারলেই আমি আনন্দ পাব।

আজকের যান্ত্রিকতার যুগে নবাগত তরুণ কবিদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কে লেখালিখির অভ্যেস ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের ক্ষেপচুরিয়াসে এমন বেশ কিছু তরুণ কবি আছেন যাদের কবিতা হঠাৎ করে আমার বাকশক্তি ছিনিয়ে নেয়, এরা কেউ একদম নতুন, কেউ আমার সমসাময়িক, কেউ-বা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু , আবার এমন কেউ আছেন যাদের হয়ত আমি চিনিই না, এদের দেখলে, কবিতা পড়লে উপলব্ধি করতে পারি বাংলা কবিতা তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতেই এগিয়ে চলেছে তড়তড়িয়ে। প্রথম দশকের অসামান্য কিছু প্রকৃত কবিতা পড়ার অনুভূতি পাওয়া যায় বলেই বুঝতে পারি বাংলা কবিতার ব্যাটন এক্ষুনি হারানোর কোনও অবকাশ অন্তত আসেনি। একজন প্রকৃত কবির মানসিক ভিত্তিভূমি তৈরি হতে যে সব ক্যামিক্যাল প্রয়োজন তার সবটুকুটাই রয়েছে এই তরুণ কবির করতলগত। এইসময় যাদের কবিতা আমার ভালো লাগছে, একনজর তাদের দেখে নিই---ছন্দম মুখোপাধ্যায়, শূদ্রক উপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, প্রশান্ত সরকার, সোমনাথ দে, বিশ্বজিৎ (রায়), অর্ঘ্য দে, মিলন চট্টোপাধ্যায়, মিলন মান্নান, সম্পর্ক মণ্ডল, সেখ সাহেবুল হক, অত্রি ভট্টাচার্য্য, সৃজন, প্রসেনজিৎ দত্ত, প্রলয় মুখোপাধ্যায়, বাপি গাইন, পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণাভ রাহা রায়, উত্তরণ চৌধুরী, দেবরাজ চক্রবর্তী, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সেলিমউদ্দিন মন্ডল, ঋষি সৌরক, ঋষভ মন্ডল, তন্ময় ভট্টাচার্য্য, তন্ময়কুমার মন্ডল, ইন্দ্রনীল তেওয়ারী, ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, রাজর্ষি ঘোষ, রাজর্ষি মজুমদার, রাজেশ চট্টোপাধ্যায়, রাজেশচন্দ্র দেবনাথ, অনীক ত্রিবেদী, অনীক মাইতি, সুপ্রিয় মিত্র, সুপ্রিয়কুমার রায়, আকাশ দত্ত, আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, শুভদীপ সেনশর্মা, শুভজিৎ ব্যানার্জী, সায়ন্তন

অধিকারী, সায়ন্তন সাহা, সায়ন্তন গোস্বামী, সমীরণ, সৌরভ ভট্টাচার্য্য, সৌরভ সরকার, জয়দীপ চক্রবর্তী, জয়দীপ মৈত্র, সায়ন (দাশ), সায়ক মুখোপাধ্যায়, সোহম নন্দী, সৈকত শী, অরিত্র দত্ত, অচ্যুত, সরোজ পাহান, সজল দাস, সুমন কুমার সাহু, নুরজামান শাহ, সমিধশংকর চক্রবর্তী, রৌপ্য রায়, মধুসূদন রায়, পার্থপ্রতিম রায়, পার্থ কর, উত্তম দত্ত, সুজিত পাত্র, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক গঙ্গোপাধ্যায়, অনিন্দ্যসুন্দর রায়, বিকাশকুমার সরকার, অয়ন দাশগুপ্ত, সঞ্জয় সোম, অনির্বাণ মজুমদার, মিঠুন মণ্ডল, প্রীতমকুমার রায়, দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়, সায়ক চক্রবর্তী, সুপ্রকাশ দাশ, বিদ্যুৎ মল্লিক, সুমিতরঞ্জন দাশ, অনিন্দ্য দুয়ারি, কৃষ্ণেন্দু পাত্র, অরুণোদয় কুণ্ডু, সুতীর্থ মুখার্জী, অভিষেক বিশ্বাস, সৌমিত্র চক্রবর্তী, সতীনাথ মাইতি, অনিমেষ সিংহ, সুমিতাভ মণ্ডল, সম্বুদ্ধ আচার্য্য, হিমাদ্রী মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস বিশ্বাস, মানস চট্টরাজ, পিনাকী সেন, পিনাকী ঘোষ, অতীন্দ্রিয় চক্রবর্তী, দিপাঞ্জন মুখার্জী, ঔরশীষ ঘোষ, শান্তনু মৈত্র, মধুসূদন রায়, ধ্রুব মুখোপাধ্যায়, সুমন ধারাশর্মা, নির্মাল্য চ্যাটার্জী, নিশান চ্যাটার্জী, তপব্রত মুখার্জী, রোহণ ভট্টাচার্য, হীরক মুখোপাধায়, রাণা বসু, সম্বিত বসু।

এদের কবিতা পড়লে মনে হয় যেন কবিতার রাশ ধরে এরা প্রত্যেকে একেক জন সব পাগলা ঘোড়া, যারা ক্রমাগত মাটিতে পা ঠুকে চলেছে। মনে হয় এরা নতুন কিছু লিখতে চায়, বাংলা কবিতাকে নতুন কিছু দিতে চায়। সাহিত্যে ক্রমেই যখন কানপচা বিষয়, অতিব্যবহৃত শব্দ, আর চর্বিতচর্বণে পাঠকদের ভারাক্রান্ত করছে তখন নিত্য-নতুন বিষয় এনে কবিতাকে সমৃদ্ধ করছে নতুন দশক। আধুনিকতা ও সমসাময়িকতার পার্থক্য থেকে শুরু করে, এই সময়ের ছেঁদো কম্পিটিশন, দ্বৈরথকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে প্রথম দশক।

ঘোড়া যেমন আছে, তেমনি বাংলা কবিতায় এসে গেছে ঘোটকীও। একসঙ্গে অনেক জন তরুণী প্রথম দশকে কাব্যচর্চা করছে। মনীষা মুখোপাধ্যায়, উল্কা, সাঁঝবাতি, স্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায়, ঊষসী ভট্টাচার্য, শ্রেয়া চক্রবর্তী, তানিয়া চক্রবর্তী, উজান, তুষ্টি ভট্টাচার্য, রিয়া চক্রবর্তী, দেবাদৃতা বসু, অনন্যা মিত্র, শাশ্বতি সান্যাল, বর্ণশ্রী বক্সী, পৃথা রায়চৌধুরী, পৃথা বারি, পারোমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেবী সাউ, টুম্পা মণ্ডল, সোনালী মিত্র, পিয়াল রায়, সুপর্ণা নাথ, মৌসুমী রায়(ঘোষ), সুচেতা রায়, সুমনা গড়াই, রুমা পণ্ডিত, মৌমিতা মণ্ডল, সুদীপ্তা ব্রহ্ম, অমৃতা মুখার্জি, শ্বেতা ভট্টাচার্য, বৈশালী মল্লিক, একা সেনগুপ্ত, শ্রীপর্ণা দে, ব্রততী চক্রবর্তী, দীপান্বিতা পাল, মামনি দত্ত, অনন্যা দেব, পৌলমী চক্রবর্তী, তিয়াসা মজুমদার, শতাব্দী চক্রবর্তী, সাগরিকা বিশ্বাস। এদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও লেখা চালিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ সাড়া জাগিয়ে শুরু করেও এখন হয়তো কিছুদিন অপেক্ষা করছে, খুব শীঘ্রই তাদের সচল রথ শব্দশর নিয়ে এগিয়ে যাবে। কাব্যলক্ষ্মী বেশিদিন চুপচাপ থাকতে পারে না। এই স্রোতটা কিন্তু খুব শীঘ্র বাংলা সাহিত্য দখল করতে আসছে।

নারীবাদী ডিসকার্সন থেকে কিছুটা দূরে একান্ত নিজস্ব নরম স্বরে নারীর সূক্ষ্মানুভূতির কথাই বলে যাচ্ছে সাঁঝবাতি, একান্ত মনোলগে উগ্র নারীবাদের বাইরে এক স্বচ্ছ হিমেল বাতাস। এ যেন এক নারীর চোখে 'সিস্টারহুডের' মতো অপর এক নারীকে দেখা, যেমন তার ২০১৪-তে দিল্লি থেকে প্রকাশিত শারদীয়া 'আত্মজা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডিসেনিয়া' কবিতায় সাঁঝবাতি লিখছে, "তোমার দিকে তাকালে মাঝে মাঝে বেচারা লাগে... / রাগী যুবতী, / তুমি ঘুম থেকে উঠতে পারছ না... / অভিমানী তুমি, / ঘুমোতেও যেতেও তো পারছ না..."। কত নরম স্বর, যেন স্নেহ পরিপূর্ণ হয়ে অপর এক নারীকে কিংবা নিজের মনকেই সে 'সিস্টারহুডের' মতো বলে চলেছে। হুগলি জেলার শ্রীরামপুর থেকে সাঁঝবাতি বারবার সেই নারীর অস্মিতা বা আইডেন্টিটির কথাই বলেছেন। সাঁঝবাতির কবিতা কখনও আরোপিত মনে হয় না, কারণ সে শুধুমাত্র তার উপলব্ধিগুলোকেই কবিতায় মিশিয়ে দেয়, মনে হয় না সাঁঝবাতি কোনোদিন একটাও কবিতা জোর করে লিখেছে। আমার ধারণা জোরালো হয় যখন ২০১৪ শারদীয়া একুশে কবিতা পত্রিকায় 'কান্না' নামক একটি

কবিতায় পড়ি, "ভোরের আলোয় জোনাকি দেখবো / সারারাত কফিনের মধ্যে থেকে / তোর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম / গলা অব্দি যেতে না যেতেই / ঠোঁট কেঁপে গ্যালো..." -- সাঁঝবাতির কবিতাই পারে শুরুতেই কান্নাকে এমন কফিন থেকে ভোরের আলোর জোনাকি দেখার এই বিরোধমূলক বিপরীত অবস্থানে নির্মিত অর্থালংকার নিয়ে আসতে, নেতি বাচকের মধ্যেও ইতিবাচক মিটমিট আশার আলো, যা না দেখার মধ্যেও থেকে যায়। সত্যি ভোরের আলোয় কি জোনাকি দেখা যায় ! তবু তো জোনাকির আলোটা থাকেই রাসায়নিক ফসফরাসে যেমন দিনের আলোতেও আকাশে নক্ষত্ররা থেকেই যায়। এইভাবেই গূঢ়ার্থ হয়ে ওঠে সাঁঝবাতির কবিতা। ওর এই আপাত নম্র স্বকীয় স্বরেই মহিলা ও পুরুষ উভয় পাঠকের কাছেই আরামপ্রদ হয়ে ওঠে, তার কথা সকলের মনের কথা হয়ে ওঠে, দৃঢ়তার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, ২০১৫-তে 'র' পত্রিকার বইমেলা সংখ্যাতে রাঙ্গজেন সিরিজের ২য় কবিতায় সাঁঝবাতি লিখছে, "আমার মেরুদণ্ডের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ স্বাধীনতা"; এই কবিতায় সে "বহুদূর থেকে একটা আলতো দরজা অপেক্ষা করছে" বলছে; দরজার বিশেষণ আলতো, এই স্বকীয় নতুন ধরনের বিশেষণের মাধ্যমেই বুঝতে পারি, এমন দরজা যা ঠেললেই খুলে যাবে, ফুলের পাপড়ি থেকে পরাগের কাছে পৌঁছনোর মতো উপমা। যৌনতার এমন গভীর উপলব্ধি বাউল দেহতত্ত্বের সমানুপাতিক হয়ে ওঠে। সাঁঝবাতির নিজস্বকৃত দর্শনকে পাঠকের সামনে অপার দক্ষতায় তুলে ধরতে পারে, সেই দর্শনে পর্ণগ্রাফি নয় বদলে ইরোটিক সাবধানী পদক্ষেপ, যেতে চেয়েও না যেতে পারার নারীর সুগভীর অব্যক্ত অনুভূতি, কেবল বিশেষত্ব এটাই, যা সমস্ত নারীর কাছে অব্যক্ত, সাঁঝবাতির কাছে তাই যেন ব্যক্ত, মৌলি'ক। সেরকমই বৃষ্টিদিনে ২০১৩-তে প্রকাশিত 'ভার্জিনিটি'র অব্যক্ত অনুভূতিকে ব্যক্ত করে তোলে, "একটা কাচের দেওয়াল /এপারে আমার প্যান্টি ভিজে যাচ্ছে / # / ওপারে তুই দরজা ধাক্কাচ্ছিস / কাচটা স্বচ্ছ কিন্তু অটুট।" এই অপারগতার ফিলিংকস্‌টা আপামর নারীর কাছেই হয়তো সমান। বৃষ্টিদিনের ওই একই সংখ্যায় 'নারীর তৃতীয় চোখ' কবিতায় সাঁঝবাতি লেখে, "শ্রীজা বলল, নারীর তৃতীয় চোখ নিচে থাকে... / এরপর, এত জল আমি রাখব কোথায় ?" দেখে আশ্চর্য হলাম, যে মেয়েটার এখনও পর্যন্ত কোনও কাব্যগ্রন্থ নেই, সে করছে তৃতীয় নয়নের সঙ্গে যোনির তুলনা ! কবিতা সিংহ, রাজেশ্বরী দেবী, মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রথম দিকের কবিতা, এবং অবশ্যই পৌলমী সেনগুপ্তের পরে দীর্ঘদিন বাংলা কবিতায় নারীর নিজস্ব সূক্ষ্মানুভূতি বলার মতো লোকের অভাব দেখা দিয়েছিল, আমার মনে হয় এখন থেকেই সাঁঝবাতি সেই অভাব দূরীকরণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা দেখাচ্ছে।

সাহিত্যের ঋণ এটাই, তার বহমানতা কখনও শেষ হয় না। ২০১৫ 'যাপনচিত্র' থেকে প্রকাশিত 'জলপাই অরণ্যের পারে' কাব্যগ্রন্থে সেই ইঙ্গিতই দিয়ে রেখেছেন হুগলি জেলার বৈদ্যবাটী থেকে আরেক তরুণী কবি মনীষা মুখোপাধ্যায় তার 'ঈশ্বরী', 'কিশোর', 'বাঘবন্দি', 'অতীত' এবং 'নির্ভয়া' কবিতায়। ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮-তে জন্ম, গদ্যে ও পদ্যে উভয়তেই স্বচ্ছন্দ মনীষার বেশিরভাগ কবিতায় নিজেকেই যেন আত্মানুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে রূপকের সাঁকো রচনা করে। তার উপর দিয়ে স্বচ্ছল পদক্ষেপে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করে তা তিনি ছুঁড়ে দেন পাঠকের দিকে, মনীষার পঙ্‌ক্তিগুলির পাশে তাই জন্যই হয়তো মৃদু আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্নবোধক চিহ্ন সাবলীল ভঙ্গিমায় কবিতার আঙ্গিক হয়ে ওঠে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মনীষার 'জলপাই অরণ্যের পারে' কাব্যগ্রন্থেকে ফেললে দেখব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ উপমাকে পরিহার করছেন কবি, যদিও 'ঈশ্বরী' এবং 'অভ্যেস' কবিতাদ্বয়ে প্রত্যক্ষ উপমা থাকলেও তা যেন কাব্যের অত্যাবশ্যকীয় নিয়মেই অধিষ্ঠিত। ২০১৫ সালের নিরিখে প্রত্যক্ষ উপমার প্রায় সচেতন বর্জন প্রক্রিয়া প্রথম দশকের সমসাময়িক কবিতার বৈশিষ্ট্যের একটা বিশেষ দীপশিখা হতেই পারে। মনীষার নির্মেদ ভাষারীতির 'ঈশ্বরী' কবিতাটির শিল্পসন্দীপী অমৃতস্বাদ এখনও পর্যন্ত তাঁর সেরা কাব্যসৃষ্টি বলতেই পারি। সেখানে মায়ের অন্তর্নিহিত নারীসত্তার সঙ্গে ঈশ্বরীর তুলনা করছেন, "মনে মনে আমার এক ঈশ্বরী আছে। / যন্ত্রণায় আমি তাকে আঁকড়ে ধরি / হিমাংশু দত্তর সুরের মতো তার মুখ। হাসি আমার মায়ের মতো। / মায়ের সঙ্গে দিব্যি বসত জমেছে তার।" এই দেবীতুল্যতা করে তোলবার বাচনভঙ্গির সঙ্গে সহজেই ধীমান পাঠকবর্গ মানবিক,

দৈবিক এবং একই সঙ্গে আত্মিক সেতু স্থাপন করে ফেলে, তারপর তা যখন "হিমাংশু দত্তর সুর" হয়ে ওঠে স্নেহপরায়ণ জননীর উপমা হয়ে উঠে আসে। মনীষার কবজি ও কলমের সেই অমেয় শক্তিতেই 'অতীত' কবিতায় সেই ছেঁড়া কথাগুলোর সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে ফেলি--"আর তুমি টের পাও না / ছেড়ে যাবার কথা বলতে বলতে---/ বলতে বলতে / আসলে বালকের মতো প্রেম লিখে চলেছ রোজ।" বাজিটা যেন 'বালকের মতো প্রেম'-এতেই মেরে যায় মনীষা। "শুধু মায়াটুকু ঝেড়ে ফেল্লেই; মার দিয়া কেল্লা !"—সত্যিই মায়াটুকুর খোলস যেন কিছুতেই খোলা ছাড়তে চায় না। 'অতীত' কবিতার পর এই বালক-অনুষঙ্গে আবার ফিরে এসে মনীষা 'কিশোর' কবিতায় লেখেন, "যতখানি হেঁটে যাও, ততখানি বসন্ত জমে, / গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবি, কুঠুরিতে কতভাবে লুকনো তুমি।" --এখান থেকেই কবিতার মূল সূচনায় একটা গাঢ় রোমাঞ্চ এঁকে দেন এই তরুণী কবি। কয়েক পঙক্তি পরেই লিখছেন, "উৎসবের পর উৎসব সাজিয়েছে শহর। / ওখানে নাগরদোলার নীচে তুমিও বালক খুব।" দ্বৈত ব্যঞ্জনা, একদিকে যেমন কাঙ্ক্ষিত পুরুষের পৌরুষত্বের আড়ালের ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয়ের স্নেহশীল চোখে দেখা, তেমনি যেন নাগরদোলার ঘূর্ণনের নীচে সেই পুরুষের বালকস্বভাব এক ধরনের উদ্বেগের লঘু সতর্কতা রচিত হয় যদি কিনা নাগরদোলা জীবনের চড়াই-উৎরাইয়ের ব্যঞ্জনার্থক হয়ে ওঠে, তখন ভাবটা এইরূপ দাঁড়ায়, কবি যেন উদ্বিগ্ন, কীভাবে যুযবে সেই বালক-স্বভাব নাগরদোলার মতো নিয়ত ঘূর্ণনশীল জীবনের এই চড়াই-উৎরাইয়ের সঙ্গে ! সেখানে "তবে এবার পায়ে পায়ে হেমন্ত আনো"--এর আহ্বান যেন কবি সেই পুরুষকেই চিরবসন্তের কৈশোর থেকে টেনে আনতে চাইছেন যৌবনের রুক্ষ হেমন্তের জীবনের সন্নিকটে। মাত্র তিন-চারটে কবিতা পড়লেই বোঝা যায়, বাংলা কাব্যগ্রন্থে এমন আপাত সরল পবিত্র স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়া জোড়ালো তরতাজা ব্যক্তিগত আলোয় মনীষার কবিতায় নতুন কী পেলাম এই প্রশ্নের চেয়েও বেশি জরুরী, যে শুরুতেই তাঁর কবিতা ভবিষ্যতে নতুন কিছু দেবার ভরসা ও প্রত্যাশার সম্ভাবনাকে তীব্রভাবে উসকে দিচ্ছে, তাই-বা কম কী ! মনীষার কবিতা যেমন একদিকে ব্যক্তিগত ভাষ্য, আত্মজিজ্ঞাসাশীল স্বগত, নির্মেদ। তেমনি স্তবকে বিভক্ত একেকটি সংযত বাক্যবিন্যাসে -- মিতভাষী, গভীর আত্মকথনে বিশ্বাসী। বর্তমানে মনীষার কবিতা অভিষেকের পথের যাত্রিক হলেও তাঁর তমোঘ্ন কলম চিনিয়ে দেয় আগামী দিনে বাংলা কবিতার ধ্রুবতারা হিসেবেই অভিষিক্ত হবার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন তিনি।

গুটি কয়েক হয়ে ওঠা কবিতার মধ্যে সিগনেচার ছাপ রেখে যেতে পেরেছে প্রথম দশকের আরও একজন অত্যন্ত শক্তিশালী কবি উল্কা। বারবার অসাধারণ দৃষ্টি - প্রগাঢ় জীবনবোধে সমৃদ্ধ এই লেখা! একদিন এ কবিতা বেরিয়ে পড়বেই শত শত ধীমান পাঠকের অভিনন্দন কুড়োতে। প্রতিটা কবিতাই নিত্য নবরূপে প্রত্যাশার উল্কাযান ভাসানোর জন্যই হয়তো উল্কার কবিতার প্রতি আমার আগ্রহ ক্রমাগত জমাট বাঁধতে থাকে। "আমাকে ঘামতে দাও.../আমি সবিনয়ে নিবেদিত হতে চাই।" – এই সাহসীকতা বাংলা কবিতায় খুব কমই পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে উল্কার আরও কিছু ভালো কবিতার উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করছি। দেবীপক্ষ ২০১৩, খনন পত্রিকায় উল্কার ১৫টি কবিতা প্রকাশ পায়। সেখানে উল্কার 'মন-ক্যামন' কবিতাটা আর একটি সার্থক সৃষ্টি, "বড় মন কেমন করে আজকাল... / মনোমালিন্যের পাট অনেকদিন হল / চুকে বুকে গেছে.../ ইদানীং গরম ভাতে ঘি / নিজের নিয়মেই গলে যায়..." আমার মতে তো কবিদের এই উপলব্ধি আর দেখার চোখকেই স্বতন্ত্র করে। আর সবাই জানে কবিকে চেনার জন্য একটা কবিতাই তার যথেষ্ট। আশ্চর্য দেখি এরপরেই উল্কা লেখে, "তোমার চেক শার্টের চৌখপিগুলোতে / আমার আড়াই চালের গুটি / এখনও চেকমেটের স্বপ্ন দেখে।/ শুধুই স্বপ্ন দ্যাখে.../#/বেড়াল আর রুমাল হয় না এখানে/ তাই মন খারাপ করি না এ যাবৎ/ শুধু মন কেমন করে..." বিশ্বাস করুন এর থেকে বেশি 'মন-কেমনে' কবিতা আমি আজ পর্যন্ত পড়িনি। আবেগ ও শব্দকে যেন ম্যাজিকের মতো বেঁধে ফেলা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ছন্দের কবিতা না হলেও কবিতার মধ্যে সাবলীল গদ্যছন্দ খেলা করে গেছে, সেখানে আরও একটি আশ্চর্য মুনশিয়ানার বিষয় চেক শার্টের সঙ্গে চেকমেট-এর অনুপ্রাসের ব্যবহার। এটাই কবিতার contemporarily বা সমকালীনত্ব। আলোচক হিসেবে আমার কাজ ভালো কবিতাকে শনাক্ত করা, বৃহত্তর পাঠকের সামনে নিয়ে আসা, উল্কার এই

তুমুল আধুনিক কবিতাটা উল্লেখ করার সময় আমি নিজেই ভাষাহীন হচ্ছি আর সেটাই বোধহয় বাংলা কবিতার পক্ষে সত্যিকারের আনন্দের খবর। খননে উল্কার আর একটি ঘোর লাগা কবিতা অর্কিড। 'বাড়িটা বদল হয়েছে এখন...' তবু দেখুন উল্কার উপলব্ধিটা 'তবে এই দু'কামরার ফ্ল্যাটটা রোজ নতুন করে ফর্দ লিখে দেয়--' এটাই হল পটুত্ব। কবিতার শেষে চলমান সংসারকে শাব্দিক উপস্থাপনা করে, "ফর্দ লেখা চালিয়ে যায় আমার সংসার।" এই সচলতাই আমরা উল্কার কাছ থেকে বারবার চাই। এইরকম সহজ ভাষাতেই সে কবিতা লিখে যাক, সে বুঝতে শিখুক এটাই তার বাক্‌শক্তি। নতুন দশকের বাংলা কাব্যে উল্কা এক উল্কাপাতের মতোই যে তার নতুন কাব্যভাষায় দু'হাত দিয়ে ছিঁড়েফুঁড়ে ফেলতে চান তথাকথিত রক্ষণশীলতার লক্ষ্মণগণ্ডী।

শূদ্রক উপাধ্যায়ের কবিতা 'সেই মেয়েটিকে দিতে চাই' অনেকদিন মনে থাকবে। "আমার রাতজাগা সব স্বপ্নগুলি / সেই মেয়েটিকে দিতে চাই/ যে আমায় খুব ভালোবাসবে..." চিরন্তনী সুর বাজে শুদ্রকের গলায়, কবিতা অদ্ভুত বাঁক নেয় শেষ স্তবকে এসে, "আসলে আমার রাতজাগা সব স্বপ্নে / সেই মেয়েটির চুল ছোট করে ছাঁটা / মোটা রোদের কাচ আর রোদ্দুর থাকে..."। প্রতিটা কবিতাতেই তিনি ছুঁয়ে যান চিরায়ত ভালোবাসার উৎসমুখ - সুখে দুঃখে তার মানস প্রিয়াকে কামনা করেন তিনি - হতে পারে শিল্প কিংবা নারী - হতে পারে সে পূর্বাপর বা নিছক মুহূর্ত কোনও, সুখস্মৃতি বা একান্তে মেলোড্রামাটিক রোমন্থন। আসলে শূদ্রকের কবিতা নিভৃতে ভাবনার খোরাক রেখে যায়, সে কবিতার বুকে ছড়িয়ে দেয় আবিষ্কারের নেশা, যেটা ঠিক জায়গা মতো, সঠিক সময় মতো ধরিয়ে দেওয়াটাও ভালো কবিতার লক্ষ্মণ। তখন সেই সম্মোহনেই পাঠককে কবির পরবর্তী কবিতার দিকে ধাবিত হতে হয়। বিভিন্ন কবিতা পড়ে দেখেছি এছাড়াও অন্তিম স্তবকে এসে কিছুটা মনঃসংযোগ রেখে যাওয়াটাও শূদ্রকের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। সেখানে সরল উপহাসের মধ্যে দিয়ে কবি অভাবনীয় মমতায় এক হৃদয়ের হদিশ খোঁজার সংকেত রাখেন পাঠকের কাছে। আমার আশা একদিন কবি শূদ্রক উপাধ্যায়, আগামীর সম্ভাবনা হিসেবে সৃষ্টির ক্লেদাক্ত জলাভূমিকে এড়িয়ে এইরূপ ধ্যানস্থ সিদ্ধির পথেই পবিত্র তাপস হয়ে উঠবে।

যাদের লেখা বারবার বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যে আসে, প্রধাণত দেখা যায়, তারাই হয়ে ওঠে দশকের সেরা, কিংবা মূল স্রোতের প্রধান কবি। আড়ালের কবিরা সামনে আসেন না বলেই তারা শেষপর্যন্ত থেকে যান অপরিচিত বা কম পরিচিত ধর্তব্যহীন আন্ডারগ্রাউন্ড কবিদের মধ্যে। অথচ এই ঔদাসিন্যে কত প্রকৃত কবি হারিয়ে যান তার সঠিক রাখতে পারলে বোঝা যেত সত্যিই সামগ্রিকার্থে দশকের সেরা কারা হয় ! শূন্য পরবর্তী দশকের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ইন্দ্রনীল তেওয়ারী এইরকমই একজন নিভৃতের কবি। ২৪শে জুলাই, ১৯৮৪-তে জন্ম, বি.এস.এন.এল-এর ইঞ্জিনিয়ার, আসানসোলের ইন্দ্রনীল তেওয়ারী আড়ালেই অসাধারণ সব কাব্যচর্চা করতে ভালোবাসেন বলে আমি তাকে ডাকি 'কবিতার মেঘনাদ'। আপাতমস্তক দার্শনিক এই কবি শব্দ ও দর্শনের মিশেলে এমন এক ঋজু অথচ সরল ভাষারীতিতে লেখেন যা কিনা পাঠকের মননে সহজাতভাবে দানা বেঁধে দিয়ে যায় অমেহ তৃপ্তির ঢেকুর। ইন্দ্রনীলের কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য, তিনি কবিতায় দর্শনকে জবরদস্তি ঢোকাতে চায় না, তা যেন আপনা আপনি সফেদ বকের ডানায় ভেসে শিকড় গেঁথে বসে। তিনি কখনও সমাজসচেতক, কখনও দার্শনিক, কখনও-বা তীব্র প্রেমিক, আমার দেখা এ এক আশ্চর্য কবির পরিমিতির, মিতকথনের বারংবার অনির্দেশ্য বর্ণালী ফুটে ওঠে তাঁর কবিতায়। আঙ্গিক, প্রকরণ এবং সর্বোপরি ভাষাশৈলীর অনুপম সামঞ্জস্যে চমকিত করে স্বশক্তিতেই হয়ে ওঠে আমার প্রিয়তম কবিদের একজন। ২০১৩ ক্ষেপচুরিয়াস পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সম্পাদনকালে প্রকাশিত 'শিরনামহীন' কবিতায় ইন্দ্রনীলের লেখনশৈলী প্রথম নজরে আসে, "এবং কখনই আমি ভালো নেই। /#/ যতবার আমি নিজেকে ভরেছি জীবনে, / ততবার উল্লাসে ঢকঢক পান করে গেছেন ঈশ্বর। / তবুও-তো কিছু মদ ছুঁয়ে থাকে গেলাস, / দেখো, / আমার দু'চোখে চার ফোঁটা জল ছুঁয়ে আছে--" – প্রথমত, নির্মাণের কৌশলে যেকোনও নতুন তরুণ কবি 'ঢকঢক' শব্দটা না-লিখে লিখত 'ঢকঢক করে', অথচ বাড়তি এই 'করে' ক্রিয়াজাত অনুসর্গটি

পরিহারেই ইন্দ্রনীল তাঁর জাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন প্রথম। দ্বিতীয়ত, এই কবিতাটি একটি মধ্যবিত্ত বিষণ্ণ দার্শনিক অনুভবের আকর রচিত করে, যখন নিজেকে প্রতিবার পরিপূর্ণ করার পর সুরার নেশার মতো ঈশ্বরের অকৃপাপ্রার্থি হয়ে ওঠে, যেন কিছুতেই জীবনটা সাজানো যাচ্ছে না, মুনি অগস্তের মতো ঈশ্বরও পান করে নিচ্ছেন সমস্ত জীবনরস, আর পানাহার শেষে গ্লাসে যেভাবে দু-চার ফোঁটা মদ লেগে থাকে, তেমনি চোখে যেন লেগে থাকে হতাশার অশ্রু। ইন্দ্রনীল যেন জানে শেষপর্যন্ত অন্য আর কিছু টিকে থাকে না, দর্শনই কবিতার একমাত্র জিয়নকাঠি। ইন্দ্রনীলের 'শিরনামহীন' কবিতার সিরিজটি আমার খুব প্রিয়, ক্ষেপচুরিয়াস ব্লগে একটা সময় গুচ্ছ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল, কিছু লাইন তুলে ধরছি, যাকে স্টেটমেন্ট বলা যায় না, গভীর আত্মদর্শন কীভাবে পঙ্‌ক্তিগুলিতে ছেয়ে আছে সেটাই বিস্ময়ভরে দেখা ও কবিকে চিনে নেওয়ার পালা,

শিরনামহীন ১ - "আমার প্রেমিকা কাপড় ছেড়ে তীব্র সকাল হয়ে গেছে।"
শিরনামহীন ২ - "অসুস্থ হতে হতে বুঝি সকলের পেছনে ঢুকে যাওয়া কামড়
হরবখত্ সুড়সুড়ি দিতে থাকে।"
শিরনামহীন ৯ - "চোখের জলে আর শরাবে কোনো পার্থক্য নেই।
দুটোই চলকে ওঠে।"
শিরনামহীন ১৫ - "নির্দিষ্ট কিছু সময় পার হয়ে গেলে
অবশ্যম্ভাবী রাত জেগে থাকে।
জেগে থাকে জমাট মাংসের মতো অন্ধকার।"

যাদের কবিতার গভীরে না গিয়ে দায়সারা পঙ্‌ক্তিসর্বস্ব নির্ভরতা ও কিছু গোল গোল গতে বাঁধা বুলি লিখে আলোচনার অভ্যেস তাঁরাও শত চেষ্টাতে ইন্দ্রনীলের কবিতাকে শুধুমাত্র পঙ্‌ক্তি উল্লেখে আলোচনা করতে পারবে না। ইন্দ্রনীলের সমস্ত কবিতাই কেন্দ্রাভিমুখী, সামগ্রিকতার তানপুরায় বাঁধা, সা ও নি কোনও সুরই একটুও এদিক ওদিক হয় না। আরও দুই তিনিটে কবিতা না দেখালে ইন্দ্রনীলকে ছোঁয়া অসম্পূর্ণ রয়ে যায়, 'শিরনামহীন-৫' ও 'শারীরিক' দুটি কবিতা এবছর শারদীয়া ক্ষেপচুরিয়ার সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে, 'শিরনামহীন-৫'-এ কবি দস্যু রত্নাকরকে সম্ভাষণ করে লিখছেন, "ওগো ডাকাত রত্নাকর,/প্রতি মুহূর্তে আমাদেরও কিছু গোপন সঙ্গম থাকে।/#/সেসব লুণ্ঠিত হলে, শোক থেকে শ্লোকে উত্তীর্ণ হও তুমি।/#/ প্রতিনিয়ত লুঠ হয়ে যায় গভীর প্রণয়ের সময়। / অথচ সময়ের উই ঝেড়ে সকল দস্যু লিখে চলে রামায়ণ।" ভাবা যায়, ভাবময়তার কোন্ শীর্ষে পৌঁছলে ভাবকল্প এরূপ দর্শনে পরিণিতি পায় ! "শোক থেকে শ্লোকে" উত্তীর্ণ হতে হতে এইধরনের কবিতার কাছে পাঠক তার নতজানু অভিজ্ঞান চেয়ে নেয়। 'শারীরিক' কবিতাটা পড়তে পড়তে যেন মনে হয় যৌনতার এ কোন অলীক দর্শন আমাদের মহাসিন্ধুর তীরে দাড় করিয়ে দিয়েছে, সম্পূর্ণ কবিতাটাই তাই দিলাম, "চুমু খেতে শুরু করলে / তুমি চোখ খোলা রাখার কথা ভুলে যাও। / হয়তো মনে মনে দেখো / পিতার প্রশান্ত মুখ; / কৃষ্ণ ঠোঁট চুষে চুষে / সিক্ত হয় রক্ত যোনী। / আর আমার ব্যস্ত / আঙ্গুল খোঁজে / তীব্র মাতৃস্নেহ রস।" মহাকালের পক্ষেও এ কবিতা হজম করা শক্ত, তার কবন্ধ দিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করে যাচ্ছেন তিনি, কখনও হিন্দি কবিতার বাংলায় অনুবাদ, কখনও সম্পুরান সিংহ কালরা তথা হিন্দি কবি গুলজারের ত্রি-পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট কবিতা ত্রিবেণীকে বাংলায় আনার (আশা করি শিশিরকুমার দাশ প্রণোদিত 'চতুর্থ চরণ অবলুপ্তি'-এর সঙ্গে চরিত্রগত কোনও পার্থক্য থাকবে), এছাড়াও হিন্দি শায়েরির মাধুর্যতাকে কোনওভাবে বাংলায় প্রকাশ করা যায় কিনা সেই নিয়েও নিভৃতে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রনীল। শুধু কবিতাতেই নয়, ২০১৪ সেপ্টেম্বরে স্প্যাস্টিকের বোতাম সংখ্যায় ছোটগল্পটা পড়ার পর ৯৪৩৪০১৬৪৬৪ নাম্বারে ফোন করে ইন্দ্রনীলকে জানালাম, তার epistolary Story এর আঙ্গিকে লেখা ইন্দ্রনীল তেওয়ারীর 'সম্পাদককে চিঠি'-টা কখন যেন ছোটগল্প হয়ে গেল বোঝাই গেল না ! গল্পের মধ্যে

অচিরেই ডুবে যাবার পর মনে হল কী আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় যেন খেলাচ্ছলে এই আঙ্গিককে আয়ত্ব করেছেন প্রথম দশকের এই সময়ের অন্যতম সেরা কবি ইন্দ্রনীল তেওয়ারী।

রোমান্টিজম্, ছন্দ আর লিরিক যে এখনও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি সেটা জানিয়েই যেন প্রশান্ত সরকার বাংলা ১৪২১-এর 'সৃজন সংকেত' পত্রিকার 'ঘুমডুবুরি' নামক কবিতায় অক্ষরবৃত্তে এক রোমান্টিজমকে আশ্রয় করে লিখলেন –"আদেশ করো, দাঁড়ায়ে তোমার গোলাম যত/ রাত-বিরাতেও ঝিনুক ভেঙে আনতে পারি / আনতে পারি, মুক্ত-মাণিক, খেলনা বাটি/ আনতে পারি, রোদ ঝাঁঝানোর ছাতার আরাম / ঘুমডুবুরি, এক ডুবে তাই, সোনার কাঠি / রুপোর কাঠি, ঘুরিয়ে দিয়ে, এই দাঁড়ালাম।" নিজের প্রেমিকাকে রাজকুমারীর আসনে বসিয়ে খাঁটি অক্ষরবৃত্তে লেখা এমন তুমুল রোমান্টিক স্বর সত্যি বলতে কী বাংলা কবিতায় খুব সাম্প্রতিককালে আমি একটাও পাইনি। যেন এইধরনের কবিতা পড়তে আর লিখতে দুটোই আজকের কবিরা ভুলে গেছেন, যদিও এর দূর্নিবার আকর্ষণ ও চিরকালীনতাকে এখনও বাংলার পাঠকরা অস্বীকার করতে পারেন না, অস্বীকার যদি করেন তবে তা আজকের কবিরাই করবেন। সুখের কথা ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩-তে জন্ম যাদবপুরের তরুণ কবি প্রশান্ত সরকার আমার দেখা অন্তত একটা কবিতাতে হলেও তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। ওই একটা কবিতার জন্যই কবিদের লিখে চলা। ছন্দে দুর্দান্ত মুনশিয়ানা দেখালেও প্রশান্ত সরকারের গদ্য কবিতার সঙ্গেই এমুহূর্তে আমরা অধিক পরিচিত। ২০১৫ 'যাপনচিত্র প্রকাশনী' থেকে প্রশান্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মেঘলা রং বান্ধবীরা' থেকে 'ফটোশপ্' কবিতায় চোখ আটকে যায়, এখানে আলাদা করে লাইন তুলে ধরার কিছু নেই, সার্বিকভাবে কবিতাটা পড়তে হবে, বুঝতে হবে ভাবনা ও ভাষাশৈলীর কী অনুপম দখল থাকলে জীবনের সঙ্গে যান্ত্রিকতাকে মিশেয়ে তীব্র উইট ও স্যাটায়ার সৃষ্টি করা যায়। প্রশান্ত কোনও চমকদার লাইন দিয়ে গিমিক সৃষ্টি করার কবি নয়, ভাবনাকে শাব্দিক ট্রান্সফর্মেশন করাতেই সে অধিক পারদর্শী। যাপনচিত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অপর আর একটি কবিতা 'শরণার্থী ভেসে আসে' কবিতায় স্বপ্নময়তার অস্থিরতা কাটিয়ে এক বলিষ্ঠ বাস্তব চেতনার পরিমণ্ডলে এসে ধরা দিয়েছে, টান নামক মূল বিশ্বাসের আকরের সন্ধানে ভাসমান এক মনুষ্যসত্তা অতঃপর আদপে নিজেকে উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত করে বিফলতার আক্ষেপ। মূল ভূখণ্ডের চোরা টান না-থেকেও থেকে যায় 'শরণার্থী ভেসে আসে' কবিতায়, "টান নেই / অথচ কী নিবিড় / বাঁধা পড়ে আছে সে সুতোর উপায় / বিস্মিত আলোর ঋতু ধরে শুধু / শরণার্থী ভেসে আসে / শরণার্থী ভেসে চলে যায়।" বহুরৈখিকতায় মনুষ্যসত্তা থেকে প্রেমসত্তায় রূপান্তরিত হয় 'শরণার্থী কবিতায়, যার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনায় পরিলক্ষিত হয় এক দ্বৈত দোনামোনা টানের সাইকোলজিক্যাল স্টেট অফ মাইন্ড, অবচেতনে ফেলে আসা প্রেমকে ফেলে আসা মাতৃভূমির মতো বারবার পেছন ঘুরে দেখা। 'কাগজের ঠোঙা'-তে প্রশান্তের 'রাস্তা' নামে আর একটা ভালো কবিতা পড়লাম, "তোমাকে উন্মুক্ত করি, যেন / তোমার ভেতরেই যত অসম্ভব খিদে / তবু ভাতের চাহিদা নিয়ে / পিঁপড়েরা রাস্তা হারালো"। আবার 'মেঘলা রং বান্ধবীরা' কাব্যগ্রন্থ পরবর্তী কবিতাগুলির মধ্যে একই পত্রিকায় 'কাগজের ঠোঙা'-তে ২০১৫, মে মাসে প্রকাশিত 'ফেরারী' কবিতাটাকে দেখি, "যে নোঙরের কাছে দায়বদ্ধ নই / তাকে কেন দিতে যাব বাঁচার করুণা / সে ঝরণা আমাকে আঙ্গিক শেখায় / বরং তার কাছে ফিরে ফিরে আসি / স্নানের অত্যন্ত কিছু খুঁটিনাটি নিয়ে"। প্রশান্তের কবিতা পত্রপত্রিকায় বীজবপণ ২০০০ সাল হলেও প্রথম দশকেই সে সব চেয়ে বেশি ডালপালা ছড়িয়েছে।

এবার যাব সেলিমকুমার মণ্ডলের নভেম্বর ২০১৪-তে প্রকাশিত কর্কটক্রান্তি পত্রিকার 'গাছ ও বাবা' কবিতাটিতে। 'প্রত্যেকটা দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা গাছ থাকে, / অশ্বত্থ গাছ। বাবার মতো...' ---এভাবে গাছ ও বাবার দাঁড়িয়ে থাকার চিত্রকল্প শুরুতেই পাঠককে গভীর দর্শনের দিকে ঠেলে দেয় এবং শেষে এই গাছ ও বাবা দুজনেই কীভাবে উনুনের (বা অগ্নি কিংবা চুল্লি বা চিতা যাই ভাবুন) মধ্যেই তার 'ফাইনাল ডেস্টিনেশন' বেছে নেয় সেকথাই লেখেন "গাছ বড় হলে / কীভাবে ভালোবেসে ফেলে একটা আধভাঙা

উনুন" –এটাই তো সব দর্শনের মূল কথা, কোথাও আদপে কিছু থাকছে না। সেলিমের গাছ আবার একটি জীবন্ত প্রাণের উপমা হিসেবে ফিরে আসে 'শিশুগাছ' কবিতায়, "তুমি মূলস্রোত থেকে বেরিয়ে এসে দেখো / ল্যাংটো শিশুটি কেমন গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে /#/ওকে একটা বীজ উপহার দাও / ওকে একটা দেশ উপহার দাও" –মনে পড়ছে 'শিশুর পিতা লুকিয়ে থাকে সব শিশুরই অন্তরে' কিংবা সুকান্তের 'ছাড়পত্র' কবিতার সেই পঙ্‌ক্তিদুটি, "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি--/ নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"– এ যেন তারই একবিংশ শতাব্দীর ভাষ্য। ফেসবুকে পোস্ট করা 'শিশুগাছ' কবিতাটিতে 'অনেকটা এভাবেই নবজাতকের কাছে দৃঢ় অঙ্গীকার রাখছেন সেলিম, অনাময় ভালোবাসার বীজ বপণ করে বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন আগামীর সবুজের জন্য একনিষ্ঠ স্নেহ। 'দেশ' শদটা এখানে অবিশ্বাস্য দৃঢ়তায় উচ্চারিত হয়েছে, বাড়তি বিশেষণ ছাড়াই শুধুমাত্র 'দেশ' শব্দ ব্যবহারেই দেশকে এক অকলুষিত জন্মভূমির পবিত্রতার রূপক হিসেবে চিহ্নিতকরণে আমরা তাঁর শক্তিশালী কবিত্বের পরিচয় পাই। কিছু অমোঘ শব্দই থাকে, যার আকর্ষণ ও তাৎপর্য যেমন দুর্নিবার তেমনি চিরকালীন ও অনাদি, যেমন – মা, ভাত, গাছ, বাবা, জন্ম, মৃত্যু, রাষ্ট্র, দেশ, সঙ্ঘ ইত্যাদি। ৭ই জুন, ১৯৯০-তে জন্ম, নদিয়ার চাপড়ার বাসিন্দা সেলিমকে আমি ডাকি 'পোয়েট ট্রি' বা 'কবি গাছ' হিসেবে, কারণ 'গাছ' শব্দের ব্যবহারে দুর্বলতার শিকার হচ্ছে সে। কারণ বারবার কোনও একটি বিশেষ শব্দকে বিবিধ রূপকে ব্যবহার করার নেশায় চাপলে বুঝতে হয়, কবি শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করছে না, বরং শব্দই কবিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, শব্দের মায়াজালে জড়িয়ে যাচ্ছে স্বল্পবয়সী সেলিম। তেমনই একটি কবিতা 'ভাতফুল-৩'-এ সেলিম অন্তিম স্তবকে লিখছে, "আরেকটা পৃথিবী পৃথিবীর মধ্যে জন্ম নিক / মায়ের গা থেকে বেরোক ভাতের সুবাস / আর অজস্র ভাতগাছ শিকড় বিস্তার করুক--/গর্ভ থেকে মৃতু পর্যন্ত।" দুয়েকটা শব্দের প্রতি বাড়তি আকর্ষণ দেখে কবিকে চিহ্নিত করা যায় না, সার্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে সেলিম একরৈখিক নির্মাণশৈলীতে এরমধ্যেই পটুত্ব অর্জন করেছে। তাই তো 'ভাতফুল-৩' কবিতায় পাই, "খিদে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিবার / আর এই রবিবারেই মায়ের জন্মদিন।" এখনও পর্যন্ত অর্থাৎ ২০১৫ পর্যন্ত সেলিমের কবিতা চুড়ান্ত একরৈখিক; ভাবনার জাগলিং, সেনেম্যাট্রিক স্টাইল সেভাবে থাকে না বলেই হয়তো তার কবিতা পাঠের সময় পাঠকদের জন্য কোনও অপার বিস্ময় অপেক্ষা করে না। সেলিমের কবিতা পাঠ করার অভিজ্ঞতা অনেকটা সত্যজিতের ফেলুদার মতো, প্রথম থেকেই যেন আমরা জানি কী ঘটতে চলেছে, তবুও পড়ার মজাটা থেকেই যায়। বাংলা 'শুদ্ধ কবিতা' পথের নবতম যাত্রিক সেলিম সস্তা টেক্সটের মতো চমকের বা গিমিকের দিকে পা বাড়াননি, প্রথম থেকে জমাট বুনোটে সেলিমের কবিতা শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট বক্তব্যে এসে স্থিত হয়, উদাহরণস্বরূপ 'তৃতীয় হাত' নামক একটি গোটা কবিতা পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম, "ঝড় উঠলেই প্রেমিকা একটা হাত উপহার দেয় আমায়। সেই হাতে আমি কাগজ পুড়িয়ে চিঠি লিখি তাঁর নামে। আর সে নৌকো বানিয়ে ভাসিয়ে দেয় জলে। সে,এই নৌকোর নাম দিয়েছে 'আদরের নৌকা'। আর এই হাতটির নাম 'অজুহাত'। ভালবাসা পেতে পেতে দু'হাত ভরাট হয়ে গেছে। তার উপহার দেওয়া তৃতীয় হাতটি কোনদিন নাকি ভরবার নয়!" যা সে বলতে চায় তা সে জানে, বিশ্বাস করে, সবচেয়ে বড় কথা, অনাবশ্যক অপ্রয়োজনীয় শব্দ এনে সেলিম তার কবিতাকে ভারাক্রান্ত করে না। তবে, বিষয় বৈচিত্র্যের যেটুকু অভাব পরিলক্ষিত হয়, অচিরেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশা করি তা কাটিয়ে উঠতে পারবে। শব্দের ব্যবহারে সেলিমের শক্তিশালী হাত আমরা দেখেই নিয়েছি, এখন এটাই দেখার, বৈচিত্র্যে, প্রতিশব্দে ও ভাবনার জাগলিং-এ ভবিষ্যতে কতটা মুনশিয়ানা সেলিম দেখাতে পারে।

মিলনের কবিতা নিয়ে অনেক জায়গাতেই আলাদা করে বলেছি, আবারও বলছি মিলনের কবিতায় এমন কিছু দর্শন লুকিয়ে থাকে যাকে খুঁজে পাবার মধ্যেই থাকে আনন্দ, ওর কবিতা বারবার পড়তে হয়। সুদূর রাণাঘাট থেকে মিলন কবিতা চর্চা করে যাচ্ছে। ওর জন্ম ১২ই ডিসেম্বর ১৯৮২, সেদিক দিয়ে বলতে গেলে বয়সে ও আমার সমসাময়িক, কয়েক মাসের ছোট। কিন্তু ওর কবিতা চর্চার মধ্যে আসাটা দেরিতে। সেই কারণেই প্রথম দশক, বয়স ওকে বাকিদের থেকে আর একটু বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়েছে।

খুব সাম্প্রতিক ২০১৫ আগস্ট মাসে মুম্বাই থেকে প্রকাশিত ‘প্রবাসে নিজভাষে’ পত্রিকায় মিলনের একটি অসাধারণ কবিতা পড়লাম, ‘অস্তাচলের মাঠ’ যেন সত্যি সাম্প্রতিকতম বাংলা কবিতায় ‘প্রান্তর জুড়ে শুয়ে আছে অশৈলী নীরবতা....।’ অস্তাচলের মাঠের অসাধারণ পঙক্তি “বুড়ো ধানের গোড়া / না ধোয়া রক্তের দাগের মতো রয়ে গেছে !” এমন মাঠের জন্যই আমাদের অপেক্ষা, সেখানেই “এই মাঠে শুয়ে / মাতাল হয়েছে কবি জ্যোৎস্নার মদে / এখানেই থেকে যাবে --- / একমুঠো সাদা ছাই হয়ে।” ওই যে শুরুতে মিলনের যে দর্শনটার কথা বলছিলাম, এটাই সেই দর্শন যার মিলনের আর একটা সূক্ষ্মতা ও চিত্র কারুকার্যের যৌথখামার। একটা টোটালিটি আছে মিলনের কবিতায়, যেটা খুব প্রয়োজন বলে মনে করি। মিলন তার কবিতা শুরু করেছিল কৃষ্ণা সিরিজ দিয়ে, ক্রমেই তার কবিতা উত্তরণের দিকে এগোচ্ছে। তার একটি দ্বি-পঙক্তির কবিতা আমার দীর্ঘদিন মনে থাকবে--- “হাসির আড়ালে লুকোনো নিজেকে নিয়ে মজা করার অক্ষম প্রয়াস। / ক্রমাগত লাথি খেতে খেতে, পা দেখলেই প্রণামের চিন্তা অদৃশ্য হয়।” – এই যে সহজ করে ক্ষোভটাকে তুলে আনা সেটা সবাই পারে না। মিলন আমাদের ক্ষেপচুরিয়াসের সহ-সম্পাদক, এছাড়াও অল্পদিনেই সে অনেক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। মিলন গদ্যটাও খুব সাবলীল লেখে।

প্রসেনজিৎ বয়সে আমার সমসাময়িক, প্রকাশে প্রথম দশকের কবি, ওর কবিতাও আমাকে মুগ্ধ করে – “মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তাই বোঝাপড়া করে নিও/সাপের খোলস তোমাকে দিতে পারিনি/কিন্তু প্রেমের খোলস প’রে প্রতি মুহূর্তে বলেছি :/ঋতু না আসার কথা।” কবির খিদে, কবির রক্তমাংস, কবিতার উপাদানের সঙ্গে ভারতীয় তাত্ত্বিক দর্শনকে মিশিয়ে প্রাবন্ধিক প্রসেনজিৎ দত্ত বলেন ‘সার্থক কবিতা মাত্রই প্রকৃত অপৌরুষের।’ প্রসেনজিতের কবিতায় আদিরস পরিমিত স্বাতন্ত্রতায় প্রায়সই দেখা যায়, সব সময়েতেই তার অল্প কিন্তু ভালো কাজ দেবার লক্ষ্য থাকে। গত বছর বইমেলাতে তার বিয়াস নামের একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। কবিতাগুলির মধ্যে থেকে যায় এক রহস্যগূঢ় ভাবতন্ময়তা। এছাড়াও প্রসেনজিৎ সনেট লেখায় বিশেষ পারদর্শী। স্বরবৃত্ত ছন্দে বেঁধে বাথানিয়া নামে ওর একটি অসামান্য সনেট পড়েই প্রথম আমি প্রসেনজিতকে চিনতে শুরু করি। তবে কবিতার থেকেও প্রসেনজিতের প্রাবন্ধিক হিসেবেই পরিচিতি বেশি।

সেখ সাহেবুল হক এই সময়ের আর একজন ভীষণ শক্তিশালী কবি --একুশে কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত ‘পরীক্ষার হল ফেরত সন্ধে’ –তে সাহেবুলের এক বিচিত্র আত্মপলব্ধি চেতনার মতো ফুটে ওঠে পাথেয় দৃশ্যগুলিতে ভর করে।। গতবছর আমাদের ক্ষেপচুরিয়াসে প্রকাশিত সাহেবুলের একটি অনবদ্য কবিতা ‘অবাধ্য ঘোড়া, ঝুপড়ির ছেলে আর হাতুড়ে কবি’; সেখানে সে লিখছে, “অবাধ্য ঘোড়া দেখনি কোনোদিন / দেখনি বয়েজ হোস্টেলের বাথরুম / কত রোমাঞ্চ থাকে লুকানো / যোগ চিহ্ন দিয়ে কত নাম জোড়া...” – যে দৃশ্যটা আমরা প্রতিদিন দেখছি তাকে শব্দরূপ দেওয়াটা কবির কাজ, তার চেয়েও বড় কাজ তার মধ্যে দিয়ে একটা দর্শনকে সামনে আনা। স্বল্পবয়সী যৌনেচ্ছাকে সাহেবুল কোন উচ্চতায় পৌঁচ্ছে দিয়েছে তা সে বয়েজ হোস্টেলের বাথরুমকে সাক্ষি রেখে লিখেছে। আবার কবিতায় সেখ সাহেবুল হক লেখে, “ষোড়শী বা অষ্টাদশীতে কিছু বদলায় না/ পৃথিবীর বয়স এখনো পাঁচশো কোটিতে থেমে আছে। / একটু সচেতন হলে, / জানলার কোণে পিষে যাওয়া টিকটিকির যন্ত্রণা বোঝা যেত।” পাঠক আমি চিত্রকল্পের গুণগ্রাহী, পাঠক আমি ঘোরের গুণগ্রাহী। সার্বিকতা, চিত্রকল্প, দর্শন, দৃশ্যতা, ভাবনা সব মিলিয়ে সাহেবুলকে ‘এখনো বুঝতে বাকি’ – “জেনেছো পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থল/ভূগোল বইয়ে কোথাও লেখা নেই/প্রেমিকেরা লুকিয়ে কাঁদে।”

একদম তরুণ সুদর্শন কবি তন্ময় ভট্টাচার্য্যের ক্ষেপচুরিয়াস পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বাবার মতো’ কবিতাটা মনে পড়ে গেল— ‘ট্রেন চলে গেলে চাঁদটা প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে / আমার ওপর নজর রাখে / বাবার মতো’। দাঁড়িয়ে থাকার আশ্রয় আর ছায়াগুলো যেন বাবার মতোই হয়। তন্ময় ছান্দসিক এবং ছন্দরসিকও বটে। সব সময় কিছু গবেষণামূলক কাজ করার জন্য মুখিয়ে থাকে। ‘রাক্ষুসী’ কবিতায় তন্ময় এইভাবে তার

ভাবনাকে ব্যক্ত করে, "মেয়েটাকে আমি শোনপাপড়ি বলে ডাকতাম / মুখ তুললেই যেভাবে ঝুরঝুরে হয়ে যেত /আহা! তার কোনো তুলনা হয় না।" সায়ন্তন সাহা লেখে 'পায়ের কাছে কিছুই নেই / হাতের কাছে তুমি... / বলা বারণ ছোঁয়া বারণ এমন সময় / কেঁদে ফেলেছি বোকার মতো' – পায়ের কাছে চাঁদের আলো কি লুটিয়ে পড়ছে নাকি সেই আলো-চাঁদ প্রেমিকার অন্য রূপ!'

অর্ণব চৌধুরীর আমি যা যা কবিতা পড়েছি তাতে দেখেছি সে ছোট কবিতা লিখতে পারদর্শী, ছোট পরিসরে নিজের ভাবনাকে সে পাঠকের মস্তিষ্কে পৌঁছে দিতে পারে, সেরকমই একটি কবিতা 'গন্ধ', যেখানে সে অত্যন্ত ক্যাসুয়াল ভঙ্গিতে লেখে, ---"বডি-স্প্রে কেনার স্বপক্ষে /আমার কোনও বিরাট ভাবনা নেই/#/ শুধু এক গন্ধের অপেক্ষা/আর এক অপেক্ষারত গন্ধময় বাস-স্ট্যান্ড।"

পবিত্র আচার্য্যের লেখার মধ্যেও আমি ব্যতিক্রমী ইমেজারির ছোঁয়া পাই, প্রেমের কবিতাগুলোতেও যেন ন্যাকাভাষ্যের বিপরীত বিন্দুতে সঞ্চারিত হওয়া ভিন্নধর্মী 'State of Mind' কাজ করে পবিত্রের কবিতায়। 'সহবস্থান' তেমনই একটি কবিতা সেখানে পবিত্রের চিত্রকল্পটা দেখুন, "বিড়ালের মত নরম কাছে আসা জানলে/এই রাস্তার দুইধারে চারাগাছই বৃক্ষ হয়ে পড়ে/শ্রীময়ীর ডান গালের তিলও গভীর পাতকুয়ো /ওর ভিতরে পেতে বসি পৃথিবীর সংসার.../.../ সং নিয়ে পড়ে থাকে শ্রীময়ী আর তার ম্যাও-ডাক/বিড়াল হতে শিখল না কুয়োর পৃথিবী/ শুধু গড়িয়ে গেল পাথরের বলের মতো।"

আত্মজা পত্রিকা থেকে পড়া একটি কবিতায় তানিয়া চক্রবর্তী লিখছে, "অনেকদিন পর তোমাকে ইতি মনে হচ্ছে/ দুলতে দুলতে ভুলে যাচ্ছি / ভারসাম্য কাকে বলে..." – তানিয়া চক্রবর্তীর কবিতা গঠিত হচ্ছে, সামগ্রিক কমোডিটাইজেশনের বিরুদ্ধে, ভিন্ন ইরোটিক স্বরে। স্প্যাস্টিক পত্রিকার সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত তানিয়ার 'জাদুঘর থেকে' কবিতা ভাবায়—"গাঢ় চুম্বনে গোল চাকতির / চতুর্থ ছিদ্রে রেখে এসো উপার্জন"। ইদানীং তানিয়ার কবিতায় অলৌকিক ঘোর আশ্রয় পাচ্ছে, লালিত্যে বড় হচ্ছে।

কাটোয়া থেকে সম্পর্ক মণ্ডল নিয়মিত কবিতা চর্চা করে যাচ্ছে। কর্মপ্রার্থী' কবিতায় সম্পর্ক সত্যি একধরনের রিলেটিভিটি তৈরি করে, ---যে যুবক আজ মারা গেল /অপঘাতে/তার রক্তের দাগ লেগে আছে/রেললাইনের পাথর-চোয়ালে।/তার উপর দিয়ে রাষ্ট্রীয় মিছিল ট্রেন /এসে/ছড়িয়ে রেখেছে যুবকের ভিড়"। হয়তো অন্য অনেক কবি এ কথা লিখতে পারলে শ্লাঘা বোধ করতেন। সম্পর্কের কবিতাবোধটা আমার ভালো লাগে। ক্রমাগত সে নিজেকে তৈরি করে যায়। কবির সত্য থেকে জীবনের জটিল অংশগুলো ধরা দেয় সম্পর্কের কবিতার ঘোরের মধ্যে।

"সারাজীবন নিজের পাসওয়ার্ড লুকিয়ে রাখতে রাখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি ক্রমশ" কিংবা "শুধু নির্জন বারান্দা থেকে হাহাকার পাঠ করতে করতে / উড়ে যাচ্ছে দুমুখো পাখির ঠোঁট"—সুদূর ঝাড়খণ্ড থেকে নিভৃতে এমন এক অপুর্ব চিত্রকল্প তৈরি করেন বেবী সাউ। আমার মনে হয় আমার পড়া বেবী সাউয়ের কবিতাগুলোর মধ্যে 'আত্মজা' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বে উল্লেখিত 'চোখ আর দৃশ্য' কবিতাটিই বেবীর এখনও অবধি আমার পড়া সেরা কবিতা। 'দৃশ্য চিত্র' কবিতায় বেবী লিখছে, "শিউলি বনে থাকে যে সাদা মনের মেয়েটি/পিরিয়ডের আগে এত্ত সব কিছুই জানত না"।

'ঋতু শেষে' কবিতায় পৃথা রায়চৌধুরী লিখছে, "চৈত্র সেলে শতকরা ছাড়ে/কিছু আবেদন বিকোয়/দর কষাকষির বাজারে।" পৃথা এই সময় জথেষ্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল কবি। তার কবিতায় একান্ত নিজস্ব 'আর্ট অফ লিভিং-এর স্পর্শ খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথার আমিত্বের ধ্যানস্থ দীক্ষায় যেন প্রতিবার নিবিষ্ট পাঠকের

মুগ্ধতা দাবি করে নেয়। পৃথার কবিতায় এমন এক অসাধারণ ইমেজারি ডেক্রিপশন যা তৈরি হয়, যাকে বলা যায় বাস্তবতা ও জাদু-বাস্তবতার মাঝের একটি বোধের বুনোট।

দীপান্বিতা পালের কবিতায় আন্তরিকতা আর নিজের কথা বেশি থাকে, ফলে তার কবিতা সব মেয়েদেরই যেন কবিতা হয়ে ওঠে। কেন যে এত কম লেখে কে জানে ! ক্ষেপচুরিয়াসের আত্মপ্রকাশ সংখ্যায় ‘প্রত্যাবর্তন’ নামের এই কবিতায় দেখুন দীপান্বিতা কী সহজ ভাষায় আত্মসমাহিত রূপ খুঁজে পাই --- “উৎসব শেষে ঘরে ফিরি / ছুড়ে ফেলি ব্যাগ, বই, কানের দুল/ চোখ বুলিয়ে নিই- চেনা আসবাব, কড়িকাঠ/ দোয়াত-কলম; না লেখা চিঠির কাগজ । / শরীর জোড়া আবির / ধুয়ে মুছে দিতে – মায়া হয় / তোমার ভালোবাসার সাত উঠোন জুড়ে / আমার অবাধ্য শৈশব / এক্কা দোক্কা খেলে, অবোধ পায়ে ...”। হয়তো এই কারণেই ছোট পত্রিকাগুলির উচিৎ দীপান্বিতাকে দিয়ে জোর করে হলেও আরও অনেক লেখানো।

২০ এপ্রিল, ১৯৮৬-তে জন্ম উত্তরবঙ্গের ছেলে গৌরব বর্তমানে থাকে হুগলির রিষড়াতে। বন্ধু ও মানুষ হিসেবে গৌরব অতুলনীয়। ২০১৫-তে ধানসিড়ি থেকে গৌরবের পাগলের জার্নাল কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ পায়। গৌরব চক্রবর্তীর কবিতাকে আমি গৌরবের অ্যাটেচিউট দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি, এই অভ্যেসটা আমার ইদানীং হয়েছে। জানি এটা খারাপ, একটা হ্যালো এফেক্ট কাজ করে যায়। আমার গৌরবের কবিতা ভালো লাগে। গৌরবের কবিতা কিছুটা দীর্ঘায়িত, কথা বলার প্রবণতা বেশি, ফলে কবিতার মধ্যে যাপনের তীব্র বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজে উপস্থিত থেকে চেতন অবচেতনের সময়াতীত মিলনে গৌরব নিজেকে মেলে ধরে বিশ্বময় অভিকর্ষের উন্মুখ প্রবেশদ্বারে--গৌরবের পাগলের জার্নাল তারই প্রামাণ্য নথি।

উত্তরবঙ্গের আরেক কবি সুমন মল্লিকের ‘হৃদফিনকি’ অসাধারণ দৃষ্টি--শক্তিমান বর্ণনাশৈলীতে প্রগাঢ় জীবনবোধে সমৃদ্ধ কবিতা। "ওমশূণ্যে একটা কুয়াশাপুতুল গিলছে আমায়"--এ লাইনটা একটা চমৎকার প্রচ্ছদ হয়েছে কবিতার। “নিষ্ক্রিয় করতে পারছি না আত্মধর্ষণের ড্রিলিং” এই লাইনে 'আত্মধর্ষণের ড্রিলিং' শব্দযুগল কবির চমৎকার ফুটিয়ে তোলে পারিপার্শ্বিক এবং উপমার চরম শীর্ষে কবি চলে যান।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এক প্রেমিকের প্রেমিকাকে ছেড়ে চলে যাওয়া নিয়ে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখতে চেয়েছিল উত্তরবঙ্গের পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু আসলে তা না-হয়ে লিখে উঠতে পেরেছিল মাত্র ৭টা অসাধারণ পঙ্‌ক্তি –“আজ থেকে দ্বিশতবর্ষ পরে /যদি দাঁড়াও তুমি /ঘুঘু ডাকা কোনো স্থবির বিকেলে / এক নিশ্চিহ্ন প্রায় দেশের কাঁধে/ আর সমস্ত শরীর নোনা হয় গঙ্গার পদ্মার / আজ থেকে দ্বিশতবর্ষ পরে জন্ম হবে মেলিগনেন্ট ভালবাসার।” আমার মনে হয় মেলিগনেন্ট এর সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি জ্বর এর একটা সম্পর্ক আছে, মানে মেলিগনেন্ট বললেই সেটা যেন ম্যালেরিয়া শব্দের পেটেন্ট হয়ে গেছে, এখানে সেই মেলিগনেন্ট এর কাপুনিটাই ভালোবাসার কাঁপুনি । আমার ভালো লাগল এই ব্যঞ্জনা প্রচণ্ড ভালো ভালোবাসার একটা প্রকট রূপ হিসেবেই এটা এসেছে। মেলিগনেন্টের কোনও যুতসই বিকল্প বাংলা শব্দ আমিও খুজে পাচ্ছি না। ছন্দেও সমান পারদর্শী পারমিতার আরও অনেক কবিতাই আমার ভালো লাগে। ‘খবর ছুটছে’ নামের একটা কবিতায় পারমিতা লিখেছিল, “খবর পিষছে খবর মিশছে/মাটি খোঁড়া আছে সাড়ে তিনহাত/ খবর ছুটছে ওইদিকেই।”

উত্তরবঙ্গ থেকে এছাড়াও ভালো লিখছে রাজা সাহা, সুভান, অরুনাভ রাহা রায়, সঞ্জয় সোম। ‘শিলিগুড়ি আনপ্লাগড়’ সুভানের একটি অনবদ্য সিরিজ, তার ৯নং কবিতাটায় সুভান লেখে—“আমার একলা মহল্লার ভেতর মালিন হল আঙুল ছুঁয়ে হেঁটে আসা লাজুক ছেলে মেয়েটা /দু একটা লোক যায় ঠিকই এই সব

রাস্তার ওপর দিয়ে, দেখেনা ঠোঁটের দিকে।"- সুভানের কবিতায় Polyphony বা বহুতানিকতা চোখে পড়ে প্রবলভাবে।

প্রলয় মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আমি বলি সে এই সময়ের বিশিষ্ট বলিষ্ট কবি। 'ঘটনাগুলো আমার না' কবিতাটার মাধ্যমে প্রলয় চিরকাল আমার কাছে একটা সম্ভ্রমের আসন ধরে রাখবে। তার কবিতার ভাষা তীক্ষ্ণ, ভাবনা অতলান্তিকের মতো গভীর, একবার দেখে নিই, 'ঘটনাগুলো আমার না' কবিতার কয়েকটা পঙ্‌ক্তি, -- "আমার বিয়ে হয়নি, আমার মেয়ে দিল্লিতে থাকে না, আমার মেয়ের বয়স বাইশ না / আমি উত্তেজিত বা চিন্তিত না। পেচ্ছাপ পেলে আবার বাথরুমে যাই / দীপকের ঠিক ওই সময় পেচ্ছাপ পায়, সদানন্দ ঘোটগালকর, শান্তনু চক্কোরবর্তি / সব্বাই পেচ্ছাপ করতে ভালোবাসি। একই কমোডে বয়ে যায় তিনটে দেশের জল।/ পুরুলিয়া, হাওড়া, বেহালা, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের নুনুতে কাঁটাতার লাগানো এমনও না/#/আমাদের সকলের দেশ নিজের শরীর দিয়ে আলাদা, বয়স দিয়ে আলাদা।" – অসাধারণ এই তীক্ষ্ণতা কেবল প্রলয়ই দিতে পারে, তবে এই কবিতা দেখে ওকে হাংরি জেনারেশনের উত্তরাধিকারী বললে ভুল হবে, এটা ওর নিজস্ব শক্তি ও ধারারই একটা অভূতপূর্ব কাব্যসৃষ্টি।

অরিণ দেব 'কথাগাছ' কবিতায় আশ্চর্য বোধ উন্মেষ করে, ওর কবিতা বোধের ইন্দ্রিয়গুলোকে আরও সজাগ করে অনুধাবন করতে হয়, এটাই অরিণের বৈশিষ্ট্য—"কথার ভিতর আশ্চর্য মৃত গাছ জন্মাল, ব্লেড-ধারে চনমনে রক্ত জন্মাল। তুমি তাৎক্ষনিক বলে দিলে সব মিথ্যা , সূর্য বলে দিল কবি মিথ্যা।কবি হেঁটে যাচ্ছে, পুনরায় পিছিয়ে যাবে না ঢেউ এর মত এ-কথা প্রেমিকা বলেছিল। ঢাউস ঘুড়ির মত প্রাণবন্ত চোখ নিয়ে কী হবে এ-কথা শ্যামা ভিখারিনী বলেছিলেন নিজের চোখ যদি ভিক্ষাথলিতে থাকে উজাগর।" –এই ভাষ্য সত্যি কবিতার ভাষ্যের বৈপ্লবিক এক অধ্যায় নির্বাচিত হতে পারে। এই শক্তিশালী কবির কবিতায় নজর না রাখলে প্রথম দশক সম্পর্কে পাঠকদের অনুসন্ধিৎসা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বাংলা কবিতার চরিত্রে এখনও প্রতিবাদী স্বর লুপ্ত হয়নি তা জানিয়েই যেন মেদিনীপুর থেকে অনিমেষ সিংহ 'অন্তঃসলিলা' কবিতায় প্রশ্ন তোলে, "হাত তুলেছি,/ধর্মাবতার, /মাটিতে দাঁড়িয়ে তুলেছি হাত।/আকাশ ধরিনি।/গাছে গাছে আটকে থাকা যতো মেঘ,/মেঘেদের ফুলেল শরীর ছুঁয়েও দেখিনি/#/এ কেমন স্বাধীনতা !" মেদিনীপুর থেকে সৈকত শী-ও খুব ভালো লিখছে।

নন্দিনী ভট্টাচার্য্য চুঁচুড়া থেকে নিয়মিত ভালো কিছু কবিতা লিখে যাচ্ছে। উড়ান নামে একটি কবিতায় নন্দিনী অসাধারণ এক আবিষ্ট দৃশ্যায়ন সামনে আনে, সেখানে নন্দিনী নিজেকে ছিন্ন করে বেরিয়ে এসে দৃপ্তভঙ্গিতে বিদ্রোহিণী হয়ে ওঠার কাব্য – নন্দিনী পিঞ্জরে থেকেও মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন খাঁচার অস্তিত্বকেই। --"সে একরাশ খাঁচা বন্দি ছটফট আগলেছে বহুকাল। /আজ তার সামনে খোলা প্রান্তর, নিখুঁত বসন্ত।/অথচ তার ডানা নেই।/পরে আছে একাকিত্বে মোড়া হৃদপিণ্ড, যার স্তরগুলো এক-এক করে খুলতেই, উড়ে গেল। /#/আমার আর পাখি হওয়া হল না।" নন্দিনীর কবজির অমেয় শক্তি বাংলা কবিতার পাঠককে নতুন স্বাদ দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রথম দশকের আরেক কবি দেবলীনা চৌধুরীর 'শয়তান' নামক একটি কবিতার লাইন গভীর ব্যঞ্জনা তৈরি করছিল--"এরপর একটা ধান গাছ চাই,যার গায়ে ট্যাটুর রঙ আমি হলদে-ফ্যাকাশে রাখবো...ঠিক করেছি।" অসাধারণ অনুভূতি। 'বধূ' কবিতায় উপলব্ধির লৌকিক প্রকাশ- "পাঁচিল এলানো সম্পর্ক হলে, / এঁটোকাঁটা তার মূলধন। /#/পাঁচিল- গোড়াতে ঘাম আসে,/মুছে দি"--এক গৃহবধূর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াশীল বৃত্ত--

তা যেমন ইট-পাথরের তৈরি পাঁচিল হয়ে ওঠে, কখনও সেই প্রবল লৌকিক রক্ত-মাংসের ত্বক-কোষপাঁচিল হয়ে ওঠে!

তন্ময় বসাক আমার আর এক পছন্দের তরুণ কবি। মালদা থেকে সে চেষ্টা করে যাচ্ছে কবিতার জন্য ভালো ও নিরপেক্ষ কিছু কাজ করার। তন্ময় কবিতা লেখে 'সৃজন' ছদ্মনামে, তার একটি কবিতা 'কাপড় পরার পর'-এ সে লিখছে, "আমি রক্ত দিয়ে লিখেছি সবুজ/থুথু দিয়ে সাজিয়েছি রং।/যন্ত্রণার চাবুক পড়ে পিঠে,/দুটো চালের বদলে ছ'টি গুলি।/#/কিছুই হইনি তবু/চোখে মুখে কালো কাপড় বেঁধে দিল ওঁরা।" --একে কি সমাজ সচেতনতা বলব নাকি চূড়ান্ত সমাজদর্শন ! কখনও এমনও মনে হচ্ছে জীবনযাপনের তীব্র বৈচিত্রও এই কবিতাটাকে এতটা আলচ্য করে তোলার ক্ষমতা রাখছে। সাম্প্রতিক আধুনিকতা ও স্বপ্নময়তার অস্থিরতা কাটিয়ে এই কবিতাটার আঙ্গিকে পলিটিক্যাল ন্যারেটিক উপস্থাপনা, ক্রমশ স্বৈরাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক বলিষ্ঠ বাস্তব চেতনার পরিমণ্ডলে এসে কবিতার নান্দনিকতার গভীরে পদার্পণ করেছে। ঘটনার বীতরাগ বিবরণ নয়, বরং ভাবময়তা, শব্দচয়ন ও প্রকাশ ভঙ্গিমায়স্পষ্ট জীবনবোধে উদ্ভাসিত। কবিতার পরিমিতি বোধ সুচারুভাবে শব্দের অপ্রয়োজনীয় ভার থেকে কবিতাকে মুক্তি দিয়েছে।

মৃত্যু, একমাত্র যাত্রার অন্তে সেই পরমের খোঁজে নিবেদিত হৃদয় সম্পূর্ণ সমাহিত অবস্থায় নিরন্তর খুঁজে চলে বাবার প্রবাদ স্পর্শ! শ্রেয়া চক্রবর্তীর 'বাবাকে' কবিতা, --"সুবর্ণরেখার জলে রেখা এলাম / বাবাকে। / বাবা এখন ঘুমাবে আর বাবার ওপর ঘুমাবে জল" – যম জিনিতের এমন অসাধারণ অন্তর্জলি যাত্রার ছোঁয়া মুগ্ধ করে। আর একটি কবিতা 'জারজ'-তে শ্রেয়া বলে, "বাবাকে দেখিনি তবু/মনে হয় তোমারই মতন/ আর কারও মতো নয়।" প্রত্যেক প্রেমিকাই তার প্রেমিকের মধ্যে এইভাবেই যেন বাবাকে খুঁজে পেতে চান, এই চিরাচরিত দর্শন লীন হয়ে যাওয়া জীবনব্যাপী প্রয়াসের মূল আকর ওঠে।

এই সময়ের বাংলা কাব্যে ঊষসী ভট্টাচার্যের মধ্যে পাই এক বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত মানবিক পবিত্র আলোর ছাপ। ঊষসীর তেমনই একটি কবিতা, 'বাবা'---"টেবিল ছুঁলেই .../নক্ষত্র জন্ম ভেসে এসেছে গর্ত-খোঁড়া স্মৃতিতে। /#/পঙ্‌তি না মেলানো বৃদ্ধ এক বলেছিল কখনও/ 'শিরদাঁড়া সোজা রাখো/জেনো বিশ্বাস হারানো পাপ'।" আদ্যান্ত শক্তিশালী ঊষসীর কবিতায় আমরা একাকীত্বের কল্পনাবিলাসের মধ্যে চলে যাই যার উপজীব্যে তোলা থাকে মানুষের চিরায়ত অন্দর্মহলের রূপ।

ফ্যান্টাসি চেতনার পথে ক্ষুদ্রাদিক্ষুদ্র ভাবনাগুলো ক্রমাগত পয়েন্টেড হচ্ছে রাজর্ষি মজুমদারের কবিতায়, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিতে রয়েছে অন্যরকমভাবে ভাবনার হদিস, তেমনি একটি কবিতা 'আক্কেল দাঁত'-এ রাজর্ষি লেখে "দাঁতগুলো আমায় ফরাসী কবিতা বোঝায়—অথবা /ছেলেটার আর্তনাদ। দাঁত ওঠে। আর আমি আক্কেলযুক্ত/গাধায় পরিণত হই ক্রমশ।" ২০১৪ আজকের অনির্বাণ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় রাজর্ষির 'ধর মেয়েটি লিখেছে' কবিতার শেষ লাইন পড়ে মুগ্ধ হই, যেন অপ্রত্যাশিত চমক অপেক্ষা করছিল এইভাবে, --"হেঁইয়ো, টান ফেলে গেছো--ঘায়েল হচ্ছে প্রেমিকারা। স্বর গড়ো। গরম মতো স্বর।/#/আর আমিও নেমে পড়ি রাস্তায়।/#/ যেন আর পথ নেই।/ সামনে দানোর মতো কিছু ..."। মহাজনপদ পত্রিকায় 'ছিলা' কবিতাটাও শেষ হচ্ছে এমন একটা দমকা হাওয়া দিয়ে, "নির্জনতা ক্রমশ ফুরোচ্ছে জানু বরাবর। রাবাংলা যাওয়ার পথে--/গাছেরা যেভাবে একা বড় হয়।" রাজর্ষির কবিতার বিন্যাস ও ধার তাকে অদূর ভবিষ্যতে স্বাতন্ত্র করবে বলেই আমার ধারণা।

পরীক্ষার খাতায় টুকে লেখা এক জিনিস আর অন্যের সাহিত্যের লাইন বাই লাইন অনুকরণ করে নিজেকে কবি-সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া আরেক জিনিস। প্রথম দশকের তরুণদের কবিতা

রচনার মধ্যেও প্লেজিয়ারিজম তার কালো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভেবে কষ্ট হয়। সহজে ও চটজলদী যশপ্রার্থী হবার জন্য অন্যের মেধা ও সাহিত্য অনুকরণ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে প্রথম দশকের অনুকরণসিদ্ধ লিখিয়ে সৈকত ঘোষের বিরুদ্ধে। অনুসরণ, অনুকরণ, অনুকৃতি, পুনর্নির্মাণ সব কিছুই ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি আত্মসাৎ-এর মধ্যেই পড়ে। সে ঘটনা যদি একবার হয় মেনে নেওয়া যায় কবির মনে একই ভাবনার ও শব্দের উপরিপাতন ঘটেছিল, কিন্তু বারবার হলে তাকে সচেতন কর্ম ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কুম্ভীলকবৃত্তির মাধ্যমে মহৎ ও মৌলিক সাহিত্য রচনা হতে পারে না। সৈকতের ইতোমধ্যেই ৫ থেকে ৬টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে -- অ্যাকোরিয়াম, রঙ বেরঙের অবাস্তব-বাস্তব, ঘুমন্ত পৃথিবীর রেপ্লিকা, @প্রেম, জরাসন্ধের বিছানা। এর আগে তরুণ গল্পকার অভীক দত্ত সৈকতের বিরুদ্ধে সাহিত্য অনুকরণের অভিযোগ এনেছিলেন, পরবর্তীকালে শূন্য দশকের নৈহাটির আরেক কবি স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তর্জাল মারফতই জানান, যে তিনি সৈকতকে 'মাছঘরের নৌকা' নামের তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ পড়তে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার সঙ্গে সৈকতের অনেক কবিতার প্রায় হুবহু মিল তিনি খুঁজে পান। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার ক্ষেত্রেও আমার ২০১২ সালে কেতকী ও পৌষালী পত্রিকাতে প্রকাশ পাওয়া 'শম্ভুদা'র চায়ের দোকান'-এর সঙ্গে অভিযান পাবলিশার্স থেকে ২০১৩ জানুয়ারিতে প্রকাশিত সৈকত ঘোষের '@প্রেম' কাব্যগন্থের 'রামুদার চায়ের দোকান' নামের একটি কবিতার ভাবনা এবং লাইন উভয়েই আশ্চর্য মিল খুঁজে পেয়ে বিস্মিত হই। আশ্চর্য হলাম এমনকি কবিতার একটি নারী চরিত্রকেও একই নামে সৈকত তার কবিতায় রেখে দিয়েছে। এছাড়াও সৈকতের কবিতা দেখলে অনেক জায়গায়ই মিনিংলেস লাগছে, মনে হয় তিনি যেন অভিধান থেকে পরপর শব্দ বসিয়ে কিছু একটা খাড়া করার চেষ্টা করেন। এই ধরণের চাতুর্যের জন্যই বাংলা কবিতায় আজকাল সবাই নাকি কবি, এইরকম কারুর কারুর জন্যই বাংলা কবিতার এই হাল !

আমি মনে করি আমাদের অনুজদের মধ্যে অন্যতম একজন শক্তিশালী কবি মেধাবী অত্রি ভট্টাচার্য্য, সমালোচনা সাহিত্য নিয়ে আগ্রহী, সোজা কথা সোজাভাবে বলতে ও শুনতে ভালোবাসেন। অত্রির জন্ম ৭ই মার্চ ১৯৮৭, থাকেন নৈহাটীর নিকটবর্তী গরিফাতে। তার কবিতা নিয়ে বলার সময় তিনটি কবিতা উল্লেখ করব। সেখানে প্রথমে সমালোচনা ও পরের অংশে আমার মুগ্ধতা – মনে হয় এই দুরকমভাবে বললে তবে অত্রির কবিতার পরিচয় পাঠকবর্গের সামনে আনতে পারব। আন্তর্জালিক ক্ষেপচুরিয়াস গ্রুপে অত্রির একটি কবিতার ছিল "এই আষাঢ়স্য দিবসে পুরনো বন্ধুরা ডিম পাড়ে, অসংখ্য / জোকার খেয়ে নেয় ড্রেন। / বানান তো কোলাজসর্বস্ব, একটা বাড়িও আছে নাকি/ ভাঙচুর ছাড়া বেঁচে রয়েছে এত ঋণ এত বচ্ছর? / বানান তো ট্রাইসেরাটপস, মাঝরাতে / সংসারে এসে দেখে চামচে চামচ ক্রস করা ! / সে আবার কবরে ফিরে যায়। তার/ হাঁটার ভঙ্গীটাও ঈষৎ নারীবাদী, পাখনাপ্রতিম। আদি /ও অসংজ্ঞাতলের মাঝখানে সে কালযোজ্য হয়ে দাঁড়ায়নি কি দায়/ এতখানি জল হেঁটে আসবার? সে আবার/ হোয়াজ্জাপে ফিরে যায়" – কী অসাধ্রণ লেখা ! অত্রি বলছে বানান তো কোলাজসর্বস্ব, সেটা চামচে চামচ ক্রস করা—যেন আর আমায় জোর করে গেলাতে হবে হবে না, উদরদেশ পরিপূর্ণ -- এমন একটি দৃশ্যকল্প শ্লেষ হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই দৃশ্যকল্প থাকলেও আমার মনে হয় অত্রির এই কবিতাটিতে তিনটি দোষ ঘটছে -- অতিশয্যতা দোষ বা Baroque Effect, অর্থদোষ বা শব্দপ্রতিপাদ্যের হীনতা এবং শব্দের অপ্রযুক্ততা দোষ। অতিসজ্জা বা Baroque যার মানে খসখসে অমসৃণ মুক্তো। এটি একটি কাব্যধারা হলেও অনেকে এটি কাব্যের দোষ বলেছেন। ব্যাপারটা হল এটা অনেকটা হল, ধ্রুপদি আঙ্গিককে ব্যবহার করে সেটিকে ভেঙে অতিনাটকীয়, সাড়ম্বর, আতিশয্যপূর্ণ শৈলী তৈরি করা হয়। বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আঙ্গিক সচেতনতা থেকেই কাব্যকে তৈরি করতে গিয়েই তাতে অতিরিক্ত রেফারেন্স, ঘটনা ইত্যাদি এবং অতিকল্পনা ও অতিশয্যতা টেনে আনেন সেই কবি । এটা তখনই হয় যখন কবি অতিরিক্ত সচেতন নিজের নাম নিয়ে কিংবা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তখন এই Baroque দোষ ঘটে এবং বাগাড়ম্বরতা এসে কবিতার সাবলীল গতিকে রুদ্ধ করে। দ্বিতীয়ত, অত্রির প্রথম লাইনে 'দিবস' শব্দটাকে হয়তো বিশেষ স্টাইলাইজেশনে আনতে চেয়েছিল যেন পুরাতন থেকে নতুন

এর দিকে প্রবাহমান্তা দিয়ে শুরু। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুতেই যেন খেলো না । ব্যাপারটা অনেকটা খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না এর মতো। এমন একটি বা একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যাতে কাব্যের উৎকর্ষতার বদলে অপকর্ষ ঘটছে যেটাকে অর্থদোষ বলে। এবং তৃতীয়ত, কবিতাতে এমন কিছু রেফারেন্স টানা হয়েছে যে শব্দগুলো শব্দ হিসেবে বাংলা কবিতায় বিরলপ্রয়োগ। এই বিরলপ্রয়োগে কবিতার গতি সেই শব্দে গিয়েই থেমে যায়। তার পরে আর এগোতে পারে না। যদিও এটি কবিতায় একটা আলাদা ব্যঞ্জনা দেয় তথাপী কাব্যপ্রকরণে সেটা দোষ হিসেবেই চিহ্নিত। দেখাই যাচ্ছে এই রেফারেন্সগুলো কবিতাকে ছুঁয়েও যেন মনকে বুড়ি ছোঁয়া করে আছে, যাকে কবিতায় শব্দের অপ্রযুক্ততা দোষ বলে। যাইহোক নিয়ম অত্রির কাছে একটা অপ্রয়োজনীয় শব্দ। ব্যাকরণহীন কাব্যধারাতেই তার কবিতা চিরকাল প্রবাহিত হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। কবি সূচনাতেই এক মহাজীবন যাত্রার কথা বলেন । এখানে একটু লক্ষ্য করলেই পাঠক দেখতে পারবেন প্রথম লাইনে "এই আষাঢ়স্য দিবসে পুরনো বন্ধুরা ডিম পাড়ে" --দুটো স্পেশাল এফেক্ট – ১) বহুবৎসরব্যাপী চলন, ২) আবার সে চলল বীজ বপণ করে। এখান থেকেই কবিতার মূল সূচনায় একটা গাঢ় রোমাঞ্চ একে দেন। বানান, ভাষাকে কাব্যের ভিত্তিভূমি তৈরি করতে যে সব ক্যামিক্যাল প্রয়োজন তার সবটুকুটাই রয়েছে কবির করতলগত শব্দের ব্যবহারে। বানানের একুশে আইনের প্রতি উইটের প্রয়োগ লক্ষ্মণীয়। অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে ফেরা এক ভিন্নমার্গীয় লেখা । কবিতার শেষের দুই লাইনে শ্লেষ চরমে উন্নিত হয়। "অনন্ত এক এক করে নোটিশ ফেলছে কুয়োয়,/মৃত সন্তানটি আর উঠে আসছে না !" সত্যি তো আদি রাজশেখর বসু বা চলন্তিকা এখন বিস্মৃতপ্রায়। এখন সর্বত্রই নোটিশ . নিশেধাজ্ঞা। কুয়োর ব্যাঙ কিছুতেই আর কুয়োর বাইরের পৃথিবী দেখতে পাচ্ছে না। ভালো লাগল সব মিলিয়ে। বিশেষ করে বিষয়। তাই আপাতত সব দোষ খণ্ডণ।

এবার পাঠক দেখুন একজন জাত কবিও তার উচ্চারণের মাধ্যমে তার পরবর্তী কবিতার দিকে আমাদের ধাবিত করে। ক্ষেপচুরিয়াস আত্মপ্রকাশ সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি কবিতা – ১) পলাতক এবং ২) নার্সিংহোমের জানালা --অত্রির সেই অসাধারণ দুটি কবিতার কথা বলি। কলাবৃত্তে ১০/৭ মাত্রা মেনটেন করে ‘পলাতক’ দুই-এক জায়গায় পূর্ণ পর্ব এক করে বেড়ে গেলেও কবিতার মূল ভাবের উচ্চতার কাছে সেটা অতি নগণ্য ত্রুটি। —“পালাতে গিয়ে বুঝতে পারি পালানো কত শক্ত, তোমার কাছে পাথেয় চাই কয়েক ফোটা রক্ত” - সূচনাতেই এক অদ্ভূত তৃপ্তি, সঙ্গে নতুন এক ব্যঞ্জনা এবং চিরকালীন দর্শন, সত্যি আমরা পালাতে চেয়েও তো পালাতে পারি না ! কিছু কিছু জায়গায় অ্যালিটারেশনের মাধ্যমে কবিতাটা আরও আত্মিক হয়ে উঠে যেন মনে হয় উপলব্ধ জৈবনিক সত্যতায় শঙ্খে বাদ্যে অভিষিক্ত হয়েছে কবির। প্রথম দশকের কবিতাকে জানতে যেসব কবিতা পড়তেই হবে তাঁর মধ্যে অন্যতম অত্রির ‘নার্সিংহোমের জানালা’কবিতাটি, যাতে কবি লিখছেন, “আমাকে প্রচন্ড ভালোবাসতে বাসতে মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল.../.../ বেহায়া ও বীতশ্রদ্ধ আমাকে ভালো বাসতে বাসতে / মেয়েটি প্রচণ্ড ঘোরানো সিঁড়ি সইতে পারল না। / মেয়েটি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে / আর আমি / আমি কিনা তখনও ভেবে চলেছি / # / কি প্রচণ্ড ভালোবাসতে বাসতে মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল।” – একরৈখিক ও বহুরৈখিক দুইরকমভাবেই ভাবার অবকাশ রাখছেন অত্রি। এই উঁচুতে উঠা কিংবা গড়িয়ে নেমে যাওয়া মানসিক ও বাস্তবিক দ্বন্দ্ব উভয়েই প্রকাশ করে। ‘বেহায়া ও বীতশ্রদ্ধ’ শব্দবন্ধদ্বয় এখানে ওপার ব্যাপ্তি এনেছে কবিতায়। তেমনি অত্রির ‘গুহামুখ’ কবিতায় প্রথম পদের ঐ 'রতিক্লান্ত আতিথ্য অপেক্ষায় থাকে' বাক্যাংশটির – রতি শব্দটি প্রধান অবলম্বন ধাতু, ধাতু আবার অন্যর্থে সঙ্গমরস। এভাবেই বেশ কিছু শব্দ প্রতীক হয়ে আসে – ‘লীলাগ্রন্থি’, ‘ষষ্ঠি হাতে’, ‘জিরোয়’, ‘উড়ন্ত কপোত’, ‘ঔরস’, ‘রত্নগর্ভা’ প্রভৃতি। পুরো কবিতায় একটা জায়গায় খুবই কনট্রাস্ট দেওয়া হয়েছে, তা হল ‘নিয়মলাঞ্ছিত পথ’; -- প্রতিষ্ঠানবিরোধী এক বৌদ্ধিক স্বাধীনতার পথে পা বাড়ানো কবির কাছে বিধি যে বাম হবেই, নিয়ম তাঁর কাছে বৈষয়িক, আর সত্যের পথ আধ্যাত্মিক। শেষে রয়েছে এক করুণ আশ্লেষের ছোঁয়া, – “শুধু জন্মচিহ্ন মুছি / ঢেউ-এর, উড়ন্ত কপোতের, বিস্তৃত সুগন্ধের”। তদগত কবি হেটে যান সত্যের পথে “যেন এক্ষুনি যাবতীয় ইচ্ছাশক্তি হরণ করে / নদীর গভীরে নেমে যাবে।” - মনের কিনারা ছুঁয়ে যায় ভালোবাসার জল – যোনির অমৃত স্পর্শে সিক্ত

করতে চান মনের উপান্তে ধূসর প্রান্তর। গুহামুখ আসলে সেই লিঙ্গ – ফাটল নয়, পুঁজিবাদ শুরুর আগে প্রকৃত সাম্যের সময়কার সেই আদিমযাত্রার প্রারম্ভিক আস্থানা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল প্রথম যাত্রা তবুও যা অর্জিত হয়েও হয়নি, তারই পথে এগিয়ে যাচ্ছে এক প্রতিষ্ঠানবিরোধী সাধক।

চুঁচুড়ার থেকে অর্ঘ্য দে 'দ্বন্দ্ব সমাস' নামক কবিতায় এক অসীম ব্যপ্তি ছড়িয়ে দেয়, "নীল ছবিতে কোনো গান থাকে না / কথাটা আমার মনে ছিল না। / যেটা শুনি সেটা আসলে আবহ সঙ্গীত.... / অন্তর্দ্বন্দ্বের সুরেলা স্বর।/একটা ছেলে বা মেয়েকে ঘিরে"। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। এমন কাব্যভাষা যেকোনও ভাষার কবিতার ক্ষেত্রেই বরণীয় ও কাম্য। জানুয়ারি ২০১৫তে দাঁড়াবার জায়গাতে প্রকাশিত অর্ঘ্যের 'একটি মহাশূন্য' কবিতায় পাই,---"সম্পর্ককে ভাগ করতে করতে / বিজোড় সংখ্যার ভাগশেষ।/#/স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি.../ফ্যাগোসাইটোসিসের কবলে জটিল রাশি"। এই শব্দচয়ন নিরন্তর ভাবনার ফসল, যাকে অধ্যাবসায় দিয়ে আয়ত্ব করতে হয়।

যাদবপুর থেকে কবিতার অন্য পরিভাষা খুঁজে নিচ্ছে কবি দেবাদৃতা বসু, তার সামপ্রতিক একটি কবিতার সিরিজ 'টিঙ্কার বেল' অদ্ভুত এক আবেশ তৈরি করে যায়, যার প্রথম কবিতাতে দেবাদৃতার স্বর অনেকের থেকেই আলাদা হয়ে ওঠে, – "চাঁদের হাফ/পড়ে থাকছে আর ফোঁটা ফোঁটা ঘুম নামে জড়িয়ে/উম্বের পিছলে থেমে প্রাচ্যের নৌযান/#/রেইনি ডের জন্ম থেকে তুলে আনো/যতি চিহ্ন/আর দোলনাটা দুলতেই থাকুক একটা ঘুমের উদ্যোগে।" দেবাদৃতা বুঝিয়ে দেয় যেন বহুরৈখিকতার নিয়ন্ত্রক লিভারটি কিন্তু সুকৌশলে কবির হাতেই থাকে। পূর্বের দেবাদৃতা তার অস্পষ্টতার মড়ক অনেকটাই আলগা করে কবিতার ভাব-দর্শনে মনোযোগ দিয়ে, নতুন দেবাদৃতা তাই অনেক পরিণত, চিন্তাশীল।

তরুণ কবি নবকুমার পোদ্দারের লেখালিখি শুরু ২০০৬ হলেও মাঝে আবার দীর্ঘদিন গ্যাপ দিয়ে আবার ফিরে এসেছেন, সেই হিসেবে নবকুমার প্রথম দশকের প্রতিনিধি। নবকুমারের কবিতাভাবনা স্বচ্ছ, কথা বলার ভঙ্গিমাটিও দৃঢ় ও স্পষ্ট। নিজের সময়কে যথাযথ তুলে ধরার ক্ষমতা এই কবির বলিষ্ঠ হাতের করতলগত। নবকুমারের একটি অসাধারণ কবিতা 'ভাবনা' ক্ষেপচুরিয়াসে সাম্প্রতিক প্রকাশিত হয়েছে, কিছুটা তুলে ধরলেই বোঝা যাবে, নবকুমারের ভাবনার শক্তি এবং উদ্দাম স্পষ্ট উচ্চারিত ভাষাশৈলীর অনুপম সামঞ্জস্য, -- "আমার কি নেই/আমার কি আছে/এ-সব ভেবে -ভেবে যারা রাতের খাবার গরম করেন/তাদেরকে আমি কুর্নিশ করি।/যেমন করি ওই দেয়ালটাকে/যাকে ছাড়া আমি উঠে দাঁড়াতে পারি না/#/আমার কি নেই/আমার কি আছে/ডুবে -ডুবে নোনাঘাট/সংবর্ধনা নিচ্ছে..."।

হুগলির ভদ্রকালী থেকে তরুণ কবি আকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মায়াময় ভাষায় কবিতা। সাম্প্রতিক কবিসম্মেলনের অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় আকাশের একটি কবিতা পড়লাম, 'কী-মায়া', আকাশ লিখছে, "সন্ধে হলেই মা চুল আঁচড়ায় / আমার মায়ের মতো আরোও লক্ষাধিক মায়েরা চুল আঁচড়ায়,/আঁচড়ায় সেসব মায়ের মেয়েরা/আর বাকি কিছু মা না হয়ে উঠতে পারা মেয়েরা।"

শেওড়াফুলি থেকে তুষ্টি 'ধোঁয়া' কবিতায় সাম্প্রতিক তৈরি করেছেন এক অসাধারণ ইমেজারি, "চায়ের ভাঁড় থেকে উঠে আসা মৃদু ধোঁয়া/শ্মশান-চুল্লির কালো ধোঁয়ার সাথে মিশে যায়"। তুষ্টি ভট্টাচার্য্যের কবিতায় এই ইমেজারিগুলো পাখির মতো উড়তে থাকে, গোপনে লালন করা মেয়েলি অভিব্যক্তি কখনও অতিশায্য মনে হয় না। গদ্য-কবিতা-প্রবন্ধে সাবলীল তুষ্টিদির কবিতায় ইমেজারি শুধুমাত্র ইমেজে সীমাবদ্ধ থাকে না, আবিষ্টতায় পরিণত হয়।

সবার মাঝে বসিরহাট থেকে সুদীপ্তা ব্রহ্মের কবিতা বিশেষ লক্ষণীয়। তার অভিমানী প্রতিবাদ পরোক্ষ সূক্ষ্মভাবে মুদ্রিত হয়ে উঠেছে নারীসত্ত্বার অবমাননার প্রতিও। ক্ষেপচুরিয়াস অক্টোবর ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত সুদীপ্তার 'সোনার ধানখেত' কবিতায় লেখে,---"ইট-কাঠ-পাথরে বাঁধা পড়েছে আজ মনুষ্যত্ব / তবু আজও সোনায়-সবুজে মোড়া/আমার মায়ের পদধূলি /খুঁজে চলেছি আমি সোনার ধানখেতে।" কথক হয়েও সামগ্রিক নারীসমাজের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন এক লহমায়। এটি সমসাময়িক বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'Women's Dignity'-এর চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে উঠেছে ব'লে আমার মনে হয়।

কী আশ্চর্য মুনশিয়ানায় 'ভালবাসলে' কবিতায় এই দশকের আরেক শক্তিশালী কবি অম্লান লেখে, "একটু ভালবাসা পেলে বুড়ো বটের মত হয়ে যাই/যে ছাগলটা আমার পাতা মুড়িয়ে খায়/তাকেও ছায়া দিতে ইচ্ছা করে।" সপ্তপর্ণে প্রকাশিত অম্লানের 'সংস্কার' কবিতাটায় দেখি, --"বিশ্বাস বুকে রাখি না/কাঁচের পাত্রে - আচারের বয়ামে/জমিয়ে রাখি।/.../কখনও-সখনও/ভঙ্গুর আধারটি সন্তর্পণে নাড়াচাড়া করি--/নির্মোহ আবেগে পরমাত্মীয়ের মত।"---এইভাবে মানসিক টানাপোড়নের দ্বন্দ্ব ও তা পরিশেষে ঘৃণায় পর্যবেশিত হবার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে স্বল্প পরিসরে ব্যক্ত করার পূর্ণতা অর্জনই কবিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে।

অয়ন দাশগপ্তের কবিতার প্রায়ই দেখা যায় কিছু তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ। মূল বৈশিষ্ট্য বিষাদ বিলাস। অণু কবিতা ও ছোট কবিতায় বার বার তাঁর বিষাদ ফিরে আসে। একাকীত্ব-ই এই কবির নিরাপদ আশ্রয়। কবিতা তাঁর কাছে যাপন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অয়নবাবুর কবিতায় তাই আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি বারবার পুনরাবর্ত করে 'বিষাদ, শ্বাপদ, নিষাদ, মন, পোড়া প্রভৃতি শব্দ। বারবার প্রত্যেকটা কবিতার মধ্যে দেখা যায় একধরণের অনস্তিত্ববাদ। তাঁর মধ্যে সহবাস করেন কবি, বিলাস করেন শ্বাপদের সঙ্গে, সেই শ্বাপদের তীক্ষ্ণ নখরকে ভয় করেও দেখেন অন্তরে সেই শ্বাপদের চলাচল। কবি শূন্যতাকে আপন করে নেন। সেখানেই তিনি নিরাপদ। প্রত্যেকটা কবিতাই তাঁর সেই বিষাদ প্রিয়তার একটা অনবদ্য উদাহরণ হতে পারে। কবিতার মধ্যে তিনি গাম্ভীর্যপূর্ণ ছান্দিক উপস্থাপনার দিকে অধিক ঝোঁক দেন। একই ধ্বনি সামঞ্জস্যের কতগুলি ক্রিয়াপদ (নামছে-থামছে-থামছে -নামছে) প্রতিটা চরণের শেষে বসে একধরণের গাম্ভীর্যপূর্ণ মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে নিরীক্ষাধর্মী অন্ত্যমিল দিয়ে। এর ফলে কবিতাগুলি পাঠকের সঙ্গে খুব সহজে সংযোগস্থাপন করতে পারে। কবি যখন বলেন "স্তব্ধ হৃদয়" "শব্দবিহীন প্রপাত হয়ে নামছে" অর্থাৎ এক নিঃশব্দ জলধারা যা অশ্রুজলকেই ডিনোট করছে, সেই জলধারা কিছুটা পথ গিয়ে আজ অনেক আগেই থামছে ! কাঁদতে কাঁদতে শুকিয়ে যাওয়া সেই শুষ্ক গাল, যার ওপর দিয়ে অশ্রুজল আর এগতে পারে না, তাই শুকিয়ে যায় মাঝপথেই। আবাহনে হৃদয় আজ তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো বিশেষ ইঙ্গিতবাহী হয়ে আসে। এমন কোনও কথা যা কোনও সাঙ্কেতিক মনবেদনা, স্মৃতিভাষ্য যা নিঃশব্দ জলধারাকে আহ্বান করে। তবে অয়নবাবুর কবিতা দীর্ঘদিন পাচ্ছি না, আবার তিনি ফিরে আসুন, সেই অপেক্ষাতেই রয়েছি। অয়নবাবু কবিতাটা খুব ভেতর থেকে লেখেন, বোঝা যায়।

একসময় সম্বিত বসুর 'বাড়ি সিরিজ', 'শ্মশান সিরিজ', 'দুপুরলিখন', 'তোকে সিরিজ' আমাকে অবাক করেছিল। ভাস্কর চক্রবর্তী এবং রাণা রায়চৌধুরীর কবিতার উত্তরাধিকারের ধ্বজা সম্বিত এপ্রজন্মেও বহন করে নিয়ে চলেছে। ২০১২-তে সম্বিত একটি কবিতা 'বাবাকে'-তে লিখেছিল, "জন্মদিন এলেই জন্মদিনগুলো মনে পড়ে/আমার যেমন...বাবারও/#/ ফোন কেককাটা উপহার / সারাদিন নায়কের স্পটলাইট /#/বাবার বেলায় এসব কে যেন মেরে দিয়েছে/#/জন্মদিনে বাবা এখন রাগ করেন/দুঃখ পান আর/খুঁজে বেড়ান বাবার জন্মদিনগুলো"। সম্বিত এখানে মনোগ্রাহীতার আন্তরিক কাছাকাছি নিজস্বতার সাক্ষর রেখেছে।

বোঝা যায় প্রথম দশক সার্বিকভাবে তাদের অগ্রজ কবিদের প্রভাবমুক্ত হলেও এখনও দুয়েকজন সেই প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। একইভাবে শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকার চিহ্নে কোথায় যেন গতি ও স্থিতির সূত্রগুলো প্রচ্ছন্নে রেখে যান বিনয়ের সাথে--"হাতের ঝুঁড়ি তার চাঁদ হয়ে জ্বলে, অভিমানী

আলো এসে চোখ আঁকে নিশিকুসুম বনে /তার ঝুঁকে-পড়া পিঠে জেগে ওঠে জগৎপরিধি অনাদি অনন্তব্যাসে ঘুরে চলে চাকা"। মনে রাখতে হবে উল্লেখিত অগ্রজ দুই কবিই কিন্তু তীব্র প্রভাব বিস্তারকারী, এবং বেরিয়ে আসতেই হবে, নইলে নিজস্ব কাব্যভাষা তৈরি হবে না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রথম দশকের বাকি কবিরা অনেক বেশি স্বাতন্ত্র নিজস্বতা তৈরির দিকে মন দিচ্ছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক স্নাতক, প্রকৃতিপ্রেমী বৈশালির 'থার্টি টু মল্লিকাবন' কাব্যগ্রন্থটি পড়তে পড়তে কখনও মনেই হবে না এটাই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তীব্র পারিবারিক ও মানসিক প্রতিকূলতা, টানাপোড়ন এবং সংঘর্ষপূর্ণ জীবনের উত্থানপতনের মধ্যে থেকেও কবি যে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় রাখছেন তা প্রশংসনীয়। সহজ সরলভাবে ছলনাহীন মনের কথা বলার মতো কবি এখন আর পাওয়া যায় না। যে কোনও ভাষার কবিতার ক্ষেত্রেই যা বরণীয় ও কাম্য। সুখের কথা, কবির এই কাব্যগ্রন্থে এমন কোনও আভরণ নেই যা পাঠককে বিভ্রান্ত করবে। বরং আদ্যান্ত সহজ ভাষাশৈলীতে বৈশালীর কবিতাগুলি যেন বাস্তব চেতনার পরিমণ্ডলে থেকেও স্বপ্নময় নান্দনিকতার গভীরে সিনড্রারেলার জাদুকাঠি ছোঁয়া জুড়িগাড়ি। তুমুল রোমান্টিজমে ডুব দিয়ে তার কাব্যভাষার সহজিয়া উচ্চারণ বৈশালীর কবিতাকে যেমন একাধারে জনসংযোগধর্মী করেছে, তেমনই মনঃসংযোগধর্মীও করে তুলেছে। প্রেমের ফ্যালাসিতে মশগুল পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাব নয়, এ কবিতাগুলি বলা ভালো বিষাদের জীবনদর্শন। কবির প্রতিটা কবিতাই যেন সাইকোগ্রাফিক সেনসিটিভিটির একেকটা প্যারালাল ট্রাডিশন, কোথাও গিয়ে যেন একধরনের স্বর্গীয় একাকিত্বে মিশ্রিত হতে চায়। পারিপার্শিক জীবন, মানবিক বোধ, সমাজ দর্শন, হিউমার, প্রকৃতি একাকার হয়ে 'থার্টি টু মল্লিকাবন' আরশিনগরের সামনে যেন কবিরই এক নগ্ন স্বত্ত্বা। পাঠক সেই স্বত্ত্বাকে দেখছেন। পাঠককে সেই নগ্নতার শৈল্পিক মৈথুনে আসতে এই কাব্যগ্রন্থটি পড়তেই হবে। কারণ আরশিনগরে প্রতিবিম্ব চিরকাল স্থির থাকে না।

কবি অয়ন মৈত্রের একটি কবিতা পড়েছিলাম অনলাইন দলছুট পত্রিকায়, সেখানে কবিতার শিরোনাম "ধরে নেওয়া যাক" শব্দটাই যেন এই শূন্যতার অর্থপূর্ণ সব দিয়ে দেওয়ার অনুভূতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করছি, "ধরে নেওয়া যাক/ ঘুমের বড়ি শেষ হয়ে গেছে পুরো । /... জানলা জুড়ে মারছে উঁকি উল্কাপিণ্ড। / সকালগুলো উঠছে জেগে সময়মতো। / আমার ঠোঁটে ভিজছে পাশবালিশ । ঠিক তোর ঠোঁটের মতো।।" এই স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে অচিন প্রকৃতির কবির মৌলিক বৈশিষ্ট প্রকাশ পায় সরল এই অনুদানে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ায়, তাড়নায়, অনন্ত তৃষ্ণায় আজ শুধু মানুষই নয় অসার প্রকৃতিও আত্মসমাহিত, নিবেদিত আদির সেই চুম্বনস্মৃতির অধরা আবেশে--"আমার ঠোঁটে ভিজছে পাশবালিশ । ঠিক তোর ঠোঁটের মতো"--এ যেন এটি অসাধারণ, অভূতপূর্ব ভাবের বিন্যাস যখন প্রিয়া থাকে না স্পর্শের সীমানায় সেই প্রহরে অমেয় প্রেম এসে উজ্জীবনের চুম্বন দিয়েছে তাকে--ক্রমশ এক অনৈসর্গিক রূপান্তর ঘটছে কবির।

সুপ্রকাশ দাশের 'ভ্যাগাবন্ড' কবিতাটা এতো জায়গায় পড়েছি আমার কাছে পুরনো হয়ে গেছে । শেষ লাইন দুটিই আসল কবিতা –"জানি/ আমাদের উৎসবের দাগ লেগে থাকবে প্রত্যন্ত হোল্ডারে"। সুপ্রকাশের লেখা এখনই কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে না। তবে আগ্রহ ভরে চেয়ে আছি তার পরবর্তী কবিতাগুলোর দিকে। সুপ্রকাশের লেখা ভালো লাগছে। কবি পিনাকী সেনের "পিপুফিশু" কবিতায় প্রকাশ করেছেন প্লেটনিক প্রেমের এক মূল বিশ্বাস--'তোর' ও 'সময়'-কে শব্দবাহক হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিটি পঙক্তিতেই ছুঁয়ে দিয়েছেন চিরায়ত ভালোবাসার অকৃত্রিম উৎসমুখ--সুখে দুঃখে তার মানস প্রিয়াকে কামনা করেন তিনি--হতে পারে সে শিল্প কিম্বা নারী - হতে পারে পূর্বাপর বা নিছক মুহূর্ত কোনো, কিংবা সুখস্মৃতি, তবু একাঙ্গে তাকে আহ্বান করেন কবি... রোমন্থনে মনে করিয়ে দেন মানস প্রিয়াকে সেই দ্বিজত্বের চলাচল...

“তোর ফুরসত্ বড়োই কম /বলা যখন হলই না শেষ অবধি/ আজ লিখব, লিখেই রেখে যাব সে সব”--লিখে যাবেন বলেই সেই সব অকিঞ্চিৎকর উপস্থিতির তন্তুজাল কেটে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

কল্পলোকে এক গ্রন্থকারিকের ভূমিকা নিয়ে অভিনব মুক্তির অমৃত আস্বাদন রাখে কবি অয়ন চৌধুরী, কবি কবিতায় সে লেখে, “আমাদের বাসভূমি জুড়ে যত নাবিক / তাদের জলোচ্ছাসে নেমে আসে স্বপ্নের উড়ালপুল।” – অয়নের বেশিরভাগ কবিতায় দেখা যায় যেখানে কবির অপ্রার্থিব ভালোবাসার স্পর্শ লাভ করেছে সার্বিক অমরতা। পরিমিত আবেগ আর মেদহীন কংক্রিট নির্মাণশৈলীতে তার কবিতা একটা স্বতন্ত্র মাত্রা পায়। এই কবির আরও কবিতা পড়ার অপেক্ষায় রইলাম।

এছাড়াও আমাকে প্রথম দশকের যাদের লেখা মুগ্ধ করে তাদের কিছু পঙ্‌ক্তি তুলে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আরও বিষদ আলোচনা করার অবকাশ রইল। কান্নাকে লুকোচুরি অভিসারে বেঁধে ফেলে মোনালিসার ‘লুকোচুরি’ কবিতাটি। বর্ধমানে পার্থপ্রতিম রায়ের কলম থেকে ছিটকে আসে -“ঘটনাচক্রে বাবার টেনশন টুকে রাখি, /টুকে রাখি চুঁইয়ে পড়া রতিসুখ।” ঋষি সৌরক তার ভিন্ন তেজি কণ্ঠস্বরে বলেন – “মাঝখানে খাবি খায় তেজি ইচ্ছেরা /কলকাতা নাভি ওঠে চা গন্ধে / মরে যাও এবং মরতে দাও।” ২০১৫-তে আগুনমুখা থেকে প্রকাশিত ঋষি সৌরকের ‘কলকাতা ’ একটি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ, যাতে রয়েছে কবিতায় এক ধরণের Decadence এর ছোঁয়া, অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে ফেরা এক ভিন্নমার্গীয় লেখা। ঋষভ মন্ডল লেখে “আমি কুকুরের মতো খোলাখুলি সঙ্গম করতে চাই /নেশা করে "চে" র মতো হতে চাই জেহাদী... /আমি বন্ধুর মায়ের চোখে শরীরী হাতছানি খুঁজে পাই /নেশা করে সমাজ বলে বরবাদী! বরবাদী!” সুচেতার নবেন্দু সিরিজের আবেদন এখন সবাই জেনে গেছে, নারীদের হাতে সেভাবে পুরুষ আগে এলেও, এই সিরিজের কবিতার মূর্চ্ছনা সত্যি আলাদা। তবে সুচেতার লেখা অনেকদিন খুজে পাচ্ছি না। সৌরভ ভট্টাচার্য নিভৃতে লেখেন বিষাদের কথা--“নিজের ধংসস্তুপ থেকে কোনরকম-এ মুখ বাড়িয়ে দেখলাম/তোরা সব বেমালুম লাস হয়ে গেছিস,”--ভাবা যায় কী লাইন! মেধাবী কবি সোমনাথ দে, যেন যাপনেই তার কবিতা অদৃষ্ট হিসেবে ছিল, তাই তো সে প্রতিদিন কবিতার নতুন ফর্ম নিয়ে ভাবে, ভাবে বৃত্তের কিছুটা বাইরে গিয়ে কীভাবে কিছু কথা বলা যায়। সহজাত সাবলীল সেই ভাষা--“সটকে পালিয়ে গেল ভীতু মশাদের দল গুঞ্জন করছে তারা ভুতুড়ে ট্রান্সফরমারের উপরে বসে/যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল বারুদের চারিদিকে বই পোড়ানোর গন্ধ বাতাসে ভাসছে রুপকথার মতো”। উত্তরবঙ্গের খুট্টিমারী জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট্ট গ্রামে বাস করে রাজবংশী কবি জয়ন্তী রায়, ‘প্রিয়তম’ কবিতায় সে লেখে “তখনই ঘুমোব আমি যখন ঘুমোবে আমার প্রিয়তম।” ভাবুন কী গভীর এই অনুভূতি। পীযুষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় একধরনের বৌদ্ধিক জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। পী্যুষ বেশ কিছু বছর ধরে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় সার্থক প্রয়োগের চেষ্টা করে যাচ্ছে। তার কাব্যভাষা উৎকর্ষ, সাবলীল। বাপী গাইন সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলার ছিল, কিন্তু তাকে আমি কোন দশক ধরব ভেবে পেলাম না, তাই এক্ষেত্রে বাপীর কবিতা সম্পর্কে কিছু না জানালেও বাপী তার কবিতায় বারবার আমাকে মুগ্ধতা করে গেছে। “আজকাল/ খনি-জ্ঞানে যাতায়াত মগজের” এমনই এক পঙ্‌ক্তি লেখে রাজেশ চট্টোপাধ্যায়। আদিসপ্তগ্রাম থেকে নিয়মিত ভালো লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছে গার্গী ভট্টাচার্য্য। ‘জীবন-অঙ্ক’ কবিতায় গার্গী লেখে, “পাড়ায় এখন সবাই আমাকে চেনে। / বাচ্ছা -পড়ানো দিদিমনি আমার নাম ! /#/এসব নিয়েই স্বপ্ন দেখি আমি /x= yমেলানোর চেষ্টা করি আপ্রাণ !” স্প্যাস্টিক পত্রিকার ‘বোতাম’ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্বজিতের কবিতা বোতাম-ভাবনাকে বরং অনেক বেশি ছুঁয়েছে---“একটা দজা খুলছে / তিনটে দরজা বন্ধ হচ্ছে / পাঁচটা দরজা খুলছে / ফোঁপাতে ফোঁপাতে / কর কৃতজ্ঞতা / কত পরিবহন। /তোমায় অ্যাডভেঞ্চার শিখিয়ে দিচ্ছে...”। পৃথা (সাহারা পৃথা জিপসি) লেখেন সেই অমোঘ অনুভূতির কথা যা যে কোনও কবি লিখতে পারলে মনে মনে গর্বিত হতেন-“আমি যাঁর উপাসনা করি,/তিনি পিপীলিকাবাহিনী।/ যাকে ভালবাসি, /সে জলচর।/যাকে ঘৃণা করতে জন্মেছি,/সে আমার মধ্যে বেঁচে থাকে।” পৃথা এখন

গৌহাটিতে পড়াশোনা করছে। সে জন্য অনেকদিন তার লেখা পাচ্ছি না, কিন্তু চাইব দ্রুত যেন পৃথা লেখায় ফিরে আসে। ছন্দম মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় দেবারতি বলে একটি নতুন চরিত্র এসেছে, 'বিষাদ' কবিতায় সে লিখছে, "নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাচ্ছেন/আদি বিষাদ।" ছন্দমের কবিতা দ্বন্দ্ব আর সিদ্ধান্তের পেন্ডুলামে উপজীব্য হয়ে ওঠে---সহজ অথচ অকৃত্রিম স্বীকারোক্তির মতো কাব্য ভাষায়। টুম্পা মণ্ডল 'সাংসারিক' কবিতায় লেখে, "বন্যা ঘেরা চতুস্তল সংসারে পাশ ফিরে শুলে আমার কাশিটা হয়তো খানিকটা কমে, তবু নিতম্ব আর স্তনের মাঝে ঝরনা নামল না তো আমি কী করব।" টুম্পার কবিতায় তন্ময়তা ও মন্ময়তা দুটোই পাই।

বরাবর দেখেছি অমৃতা মুখোপাধ্যায়ের (মুখার্জি) কবিতায় একটা লিরিকের আবেশ থাকে। মূলত রোমান্টিসিজমের অনুসারী কবি অমৃতা। আমি বরাবর মুগ্ধ হই। তাকে আলাদা করে খুঁজে পেলাম, 'মন ভালো নেই' কবিতায়, যার প্রথম লাইনেই অমৃতা বলে,---"'মন ভালো নেই'—এই অসুখ সারে না।" সত্যি আমাদের কারুর এই 'মন ভালো নেই' অসুখ সারে না। সত্যের শাব্দিক প্রতিষ্ঠাই অমৃতার কবিতার মূলরস।

দলছুটে প্রকাশিত কবি অপূর্ব বোসের 'রিভান্দ্রাম সিরিজ১-' কবিতাটার পাঠের প্রাক্মুহূর্তের প্রস্তুতি একটু দীর্ঘতর ; তাতে অবশ্য মজাই পেলাম- পাঠকের কাছে একটা ভিন্নতোর মাত্রা ও রহস্যময় ভাঙাগড়ার মধ্যে মায়াবী নির্মিতি হয়ে প্রথমেই ধরা দেয় এই কবিতাটা । এই ধরণের কবিতা পাঠের জন্য পাঠকের প্রস্তুতিও অভিযোজিত হওয়া আক্ষরিক অর্থেই জরুরী । কবিতার মধ্যে পুরোমাত্রায় রয়েছে মৌলিকতা এবং ভাবের অভিনবত্ব! কবিতার মধ্যাবর্তের কয়েকটা পঙক্তিতে অবিশ্বাস্য অনুভূতির ছোঁয়া রেখে যান কবি – "নাড়ীনক্ষত্রহীন এক বোধের সন্ধানে যখন ফিরছে একটা কেউ, / ভেজা বালির ওপর ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে মার্গ সঙ্গীত/এক নিস্তব্ধ কোলাহলের মাঝে।/একা একা নিজের দুপায়ে দাড়িয়ে থাকা ভীষণ কষ্টকর /... দু হাতের ভরে যখন দাঁড়াতে যাই, চতুষ্পদী হয়ে যাই, / তখন কোন মহত্তম কবিতা আসে না, কেবল আসে এক / ব্যর্থ মৃত্যুচেতনা অবিরত, নেমে আসে ভেজা চুলের ফাঁক বেয়ে...." এতে কবি শিল্পকে নিয়ে এসেছেন প্রিয়মানুষের সমতলে--তার অপরূপ চেতনায় অধরা শিল্প যেন তারই খুব নিকটজন কেউ - জীবনের অংশীদার! একই সঙ্গে শ্লেষের চরমে সত্যের আবেশ--মানবিক চেতনায় অবিশ্বাস্য পশুত্ববোধ উঠে আসে তাঁর এই পঙক্তিতে--"দু হাতের ভরে যখন দাঁড়াতে যাই, চতুষ্পদী হয়ে যাই,"। সেই শ্বাপদের তীক্ষ্ণ নখরকে ভয় করেও দেখেন অন্তরে সেই শ্বাপদের চলাচল।

অনুপমা বসুর 'ভূমি (তট+পট+চেনা)' কবিতায় সুন্দরকে কবির দেওয়া অমোঘ স্বীকৃতি... প্রতিটি স্তবকের একই লাইনে একটা বৃত্ত পরিলক্ষিত হয় যেমন ১-৫-৯ , ২-৬-১০, ৪-৮-১২। কবিতার ভাষ্য মৃদু, যেন জৈবনিক সংঘাতের মুখোমুখী দাঁড়াবার প্রসাদী ঢাল। "সুখ আসে যায় /পটভূমি ঘুরে দাঁড়ায় / আলোকময় কিছুটা বেলা /মদিরার আবেশে মাতায় ..."। ভূমির গর্ভ থেকেই জন্ম নেয় জীবনের অনুষঙ্গ... বেঁচে থাকার প্রতিযোগী ইচ্ছেরা। একটা কথা অবশ্যই বলতে হয়--একই ধ্বনি সামঞ্জস্যের কতগুলি ক্রিয়াপদ (যায়-দাঁড়ায় কুড়ায়-যায় –দাঁড়ায়-মাতায়-জায়-জাগায়-মাতায়) প্রতিটা চরণের শেষে বসে কবিতাটার মধ্যে এক ধরণের ধ্বনিদোষ এনেছিল ; সুনীলদা প্রায়ই তরুণ কবিদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলেন "একইধ্বনি সামঞ্জস্যের ক্রিয়া দিয়ে, বা দুটো লাইনে পরপর ক্রিয়াপদ কখনোই আনা উচিৎ নয়"। এই কবিতাটা আলোচনা করতে গিয়ে হঠাৎ সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল, তাই বললাম। যাইহোক অনুপমার কবিতায় শেষের আত্মদর্শনের ইঙ্গিতটি বড় ভালো লেগেছিল।

যাল শেষ পর্যন্ত আমি তরুণ কবিদের নিয়ে লিখে ফেললাম। তাই আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে আমার মনে পড়ে গেল সম্ভবত ২০১০-২০১১ এর নোবেল প্রাপ্তির পর কবি টোমাজ ট্রান্সটোমার সেই অসাধারণ মন্তব্য---"The Worst has Finally happened."। যে কটি ক্ষেত্রে সমালোচনা করলাম, মনে

রাখতে হবে এক্ষেত্রে বিষয়ের কিছু খণ্ডাংশ শিল্পী তার শিল্পমাধ্যমের দ্বারা তুলে ধরেন। অস্পষ্ট কিছু ছবি, রূপক, ব্যাঞ্জনা, ভাব, আঙ্গিক, পরিবেশ, পার্শ্ব বিষয়বস্তু, আবহ, উপমা, ছন্দ, রঙ, ঘটনা , আঁচড়---এইগুলো একক বা সমষ্টিগত ভাবে শিল্প গ্রাহককে তার বোধ ও চেতনার মধ্যে দিয়ে চালনা করে। ভাবনার দিকগুলো উন্মুক্ত হলে সেই শিল্পরস আস্বাদন করবার জন্য প্রয়োজনীয় সুতোগুলোকে মেলাতে থাকে ও বিষয়কে খুঁজে পেতে চায়। হয়তো আমি পাঠক হয়ে সর্ব মুহূর্তে তা মেলাতে পারিনি, কবির বোধের পরিসরে নিজেকে হারিয়েও ফেলতে পারি। কবি যে খারাপ তা নয়, আমি নিজেই হয়তো পাঠক হিসেবে খারাপ। তাই কবিকে ছুঁতে পারিনি। যাইহোক, শেষ করার আগে চুঁচুড়ার প্রথম দশকের কবি নন্দিনী ভট্টাযার্য্যের 'নিন্দে করা' কবিতার কয়েকটা লাইন দিয়ে শেষ করি, --- "প্রশংসাতে বেঁহুশ হয়ে, / ভাঙল মাথায় বাজ,/ আমি মানি নিন্দা করা, / বড্ড কঠিন কাজ।" শেষপর্যন্ত কিন্তু আমরা ফিরে আসি কবিতার কাছে, কবির কাছে। মনে পড়ে যায়, সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-এর সেই কথা---

"আমরা যতই বিশ্লেষণ করি না কেন, দেখি সব শেষে এক কবি বসে আছে"।